
রূপকথার
রাজ্য

Approved by the D. P. I., West Bengal

রূপকথার রাজ্য

শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ

অ শো ক পু স্ত কা ল য়
প্র কা শ ক ও পু স্ত ক-বি ক্রে তা
৬৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

॥ নূতন সংস্করণ ১৩৭৬ ॥

মূল্য [redacted] টাকা মাত্র

৬৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯, অশোক পুস্তকালয়ের পক্ষ হইতে শ্রীভারতী দেবী কর্তৃক প্রকাশিত ও সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত এবং ১৮৩, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৪, শ্রীসুরেন্দ্র প্রেস হইতে শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা

সেকালে ঠাকুরমা, দিদিমা বা তৎস্থানীয়া বর্ষীয়সী মহিলারাই রূপকথা শোনাতেন ছেলেমেয়েদের। যুগের পরিবর্তনে তাঁরা আজ আর গল্প বলেন না, ছেলেরদলও তাই পায় না গল্পের রস। সুতরাং ভাবীকালের মানুষদের রূপকাহিনীর কল্পকথা শোনাতে সাহায্য নিতে হয় কাগজ কলমের।

সব দেশেই রূপকথার আদর আছে। একই গল্প বিভিন্ন দেশে প্রচলিত দেখা যায়। এই কারণ রূপকথার জন্মভূমি হচ্ছে এশিয়া মহাদেশ। প্রাচীন ভারত, আরব-পারস্য ও চীন-জাপানের রূপকথা থেকেই গড়ে উঠেছে পাশ্চাত্য জগতের রঙীন কল্পকথা।

এই বইয়ে পনেরটি দেশের পনেরটি গল্প স্থান পেয়েছে। গল্পগুলো ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বনে রচিত। কেননা সব দেশের রূপকথাই ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

দেশ-বিদেশের রূপকথার রসাস্বাদন করবার সাথে সাথে ছেলেমেয়েরা সে দেশের জীবনযাত্রা ও রীতিনীতি লক্ষ্য করে কিছু শিখতে পারলেই আমার 'রূপকথার রাজ্য' গড়ার পরিশ্রম হবে সার্থক।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ (রাজসাহী)
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮

শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ

সূচীপত্র

বোতল পাহাড়ের গল্প

(আয়ারল্যাণ্ডের উপকথা)

বোতল পাহাড়ের গল্প—কথাটা শুনে তোমরা বোধ হয় অবাক হচ্ছ, ভাবছ, এ আবার কি গল্প। কিন্তু গল্পটি সত্যই আয়ারল্যাণ্ডে চলিত আছে।

আজকাল তোমরা পরীর দেখা পাও না। কিন্তু, প্রাচীনকালে তাদের হামেশাই দেখা যেত। মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে পরীদের বেশ একটা যোগাযোগ ছিল।

সে সময়ে আয়ারল্যাণ্ডে কোন এক গ্রামে মিক্ নামে এক কৃষক ছিল। সে খুব ভোরে জমিতে বেরিয়ে যেতো আর ফিরতো সূর্য অস্ত যাবার পর। কৃষকের সব কাজেই সাহায্য করতো তার বৌ—তাদের ছেলেমেয়ে তখন ছোট ছিল কিনা। তার বৌ বাড়ীর কাজকর্ম দেখতো, দুধ দুইতো এবং বাড়ীর হাঁস আর মুরগীর ডিম বাজারে বিক্রী করে আসত। এভাবে বছর বছর তাদের কিছু সঞ্চয় হতো।

যাহোক্, তারা মোটামুটি সুখেই ছিল। কিন্তু সে বৎসরে তাদের ভয়ানক কষ্টে পড়তে হলো। দিনের পর দিন অবিরাম বৃষ্টির ফলে জমির সমস্ত ফসল নষ্ট হয়ে গেল, শুধু তাই নয়, তাদের মুরগীগুলো মরে গেল, আবার শূয়োরগুলোও পড়লো অসুখে। এদিকে আবার জমিদারের কাছে কিছু ঋণ ছিল। সেই ঋণ পরিশোধ করে হাতে এক কপর্দকও রইলো না। সুতরাং তারা জমিদারের খাজনা দিতে পারে না, আর আহারের সংস্থানও করতে পারে না।

গালে হাত দিয়ে আর কতদিন চাষীর ছেলে মিক্ বসে বসে ভাবতে পারে? একদিন সে তাই তার স্ত্রী মোলিকে বললো—এখন কি করবো বলতো?

মোলি জবাব দিল—কি আর করবে? গরুটাকে নিয়ে কাল হাটে যাও, মঙ্গলবার শুভদিন, সুতরাং আগামী কাল যাত্রা করতে পার।

গরুটাকে বিক্রী করবার ইচ্ছা মিক্-এর ছিল না, সে উদাসীনভাবে জিজ্ঞাসা করলো—কিন্তু তারপর?

'ও! তুমি ভবিষ্যতের কথা ভাবছ।'

'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই ধরেছ। আচ্ছা যাক, তা'হলে কালই যাব। হ্যাঁ, আমার কোটটা ছিঁড়ে গেছে, সেটা সেলাই করে রেখো।'

পরের দিন সকালে মিক্ একটা লাঠি হাতে গরুটাকে সঙ্গে করে বাড়ী থেকে বের হলো হাটের পথে।

আজকের দিনটা সত্যিই ভারী সুন্দর। সূর্যদেব ছড়িয়ে দিয়েছেন চারধারে তাঁর উজ্জ্বল কিরণ, আর সেই কিরণ মাঠের পথে, গাছের মাথায় কি চমৎকার না আলো-ছায়ার সৃষ্টি করেছে।

হাট বহুদূরে। ছ' মাইল পথ চলবার পর মিক্ ছোট একটা পাহাড়ের কাছে এসে পৌঁছল।

সুপ্রভাত! একজন লোক তার সামনে এসে দাঁড়ালো।

সম্ভাষণের প্রত্যুত্তর দিয়ে মিক্ লোকটাকে ভালো করে দেখলো। লোকটা একটা বামন। তার মুখের রং হল্‌দে, নাক ঈগল-পাখীর ঠোঁটের মত সরু, আর চোখ দু'টো উজ্জ্বল, দৃষ্টিও তার তীক্ষ্ণ।

বেঁটে মানুষটার তাকানোর ধরন ভালো মনে হ'লো না মিকের। তাই সে তাকে এড়িয়ে গরুটাকে তাড়িয়ে নিয়ে চললো। কিন্তু বামনটা তাকে ছায়ার মত অনুসরণ করতে লাগলো। মিক্ পড়লো ভাবনায়। তার আজ বেরোবার ইচ্ছে ছিলো না—কি কুক্ষণেই না সে আজ বেরিয়েছে।

বামন জিজ্ঞাসা করলো—ওহে, তুমি গরু নিয়ে কোথায় চলেছ?—লোকটার গলার স্বরে ভয় পেয়ে মিক্ উত্তর করলো—হাটে যাচ্ছি।

'তুমি কি গরু বিক্রী করতে যাচ্ছ?'—বামন বললো।

'কেন? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বিক্রী করবো।'—মিক্ উত্তর দেয়।

'তা হ'লে আমাকেই দিয়ে দাও।'—বললে বামন।

মিক্ এগিয়েই চললো, বেঁটে লোকটার সঙ্গে আর সে কথা চালাতে রাজী নয়, কেননা সে মনে বেশ ভয় পেয়েছে। যাহোক্, সে বামনের কথা শুনে জিজ্ঞাসা করলো—তুমি এর কি দাম দেবে ?

বেঁটে বামনটা তার কোটের মধ্য থেকে একটা বোতল টেনে বের করে বললো—আমি তোমাকে গরুটার বদলে এই বোতলটা দেব।

মিক্ প্রথমে তার দিকে তারপর বোতলটার দিকে চেয়ে দেখলো। সে ভয় পেয়েছিল বটে, কিন্তু বোতলটা দেখে সে হো হো করে খুব হেসে উঠলো।

বেঁটে লোকটা রেগে বললো—তুমি হাসতে পার! কিন্তু হাটে গরু বিক্রী করে যা পাবে, তার চেয়ে ঢের ভালো এই বোতলটা।

মিক্ হেসে বললো—তুমি কি আমাকে এমনই বোকা পেলে যে, একটা সুন্দর গরুর বদলে একটা খালি বাজে বোতল নেব ? মোলি কি বলবে ? আমরা কি করে জমিদারের খাজনা শোধ দেব ?

বামন তখন তার স্বর মোলায়েম করে বললো—দেখ, আমি যা বলি তাই কর, নইলে হয়ত দুঃখ পাবে। কে জানে কি বিপদ তোমার সামনে আছে ? গরুটা তোমার পথে মরে যেতেও পারে। হাটে অনেক গরু এলে তোমার গরুর দাম কমে যাবে। যাক্, আমি এসব বলেই বা কি করবো, তুমিতো শুনবে না।

'যদি আমি মনে করি যে, বোতলটা আমার উপকারে আসবে তাহ'লে গরুটাকে'—

বামন মিক্‌কে বাধা দিয়ে বললো—আমি মিথ্যে বলছি না, বোতলটা নাও, আর যা-যা বলি বাড়ী গিয়ে তাই কর।

কিন্তু মিক্ তার গরুটাকে এভাবে ছেড়ে দিতে মোটেই রাজী হ'লো না।

'আচ্ছা বেশ! আমি বেশীক্ষণ থাকতে পারবো না। আমি তোমাকে আবার বলছি—এটা নিয়ে বড়লোক হও। আর যদি না নাও, তাহ'লে তোমাকে ভিক্ষার পাত্র হাতে করে দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হবে। অভাবের

তাড়নায় স্ত্রী-পুত্র মারা যাবে'—এই কথা বলে বামনটা এমন অদ্ভুত মুখভঙ্গী করলো যে, তাকে খুব কুৎসিত দেখাতে লাগলো।

অবশেষে মিক্ ভয় পেয়ে বোতলটা নিলে। সে বললো—গরুটাকে নাও, কিন্তু তুমি যদি মিথ্যে বল—

'আমি যা বলছি যদি তা কর, তাহ'লে আমার কথা সত্য হবে। তুমি বাড়ী গিয়ে তোমার স্ত্রীকে ঘরের মেঝে ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করতে বলবে। তারপর টেবিলের উপর একটা সুন্দর কাপড় বিছিয়ে বোতলটাকে রেখে বলবে—"বোতল তোমার কাজ কর।" তারপর কি হয় দেখবে।'

'আর কিছু?'—মিক্ জিজ্ঞাসা করে।

'না, আর কিছু নয়। আচ্ছা তাহ'লে আসি'।—এই বলে গরুটাকে নিয়ে বামনটা চলে গেল। মিক্ তখন বাড়ীর পথে রওনা হ'লো। সে ভয় করতে লাগলো, হয়ত তার স্ত্রী তাকে তার নির্বুদ্ধিতার জন্য বকবে।

সন্ধ্যার আগেই সে তার বাড়ী ফিরে এলো। মোলি আগুনের কাছে বসেছিল, সে উঠে এসে জিজ্ঞাসা করলো—তুমি যে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এলে? কি হ'লো? গরু বিক্রী করে কত পেলে?

'তুমি আমাকে সমস্ত কথা বলবার অবসর দিচ্ছ কৈ'—মিক্ টেবিলের উপর বোতলটা রেখে বললো—'আমি গরুটাকে এটার বদলে একজনকে দিয়ে এসেছি।'

তার স্ত্রী তার দিকে কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে থেকে বললো,—'আমি জানতাম না যে, তুমি এত বোকা। এখন কি করে আমাদের দিন চলবে?' —এই বলে সে বসে পড়ে কাঁদতে শুরু করলো।

'আহা! ব্যাপারটা সব শোন আগে'—এই বলে মিক্ তখন সব কথা খুলে বললো।

এদিকে মিকের স্ত্রী কিন্তু পরীর কথা বিশ্বাস করতো। সুতরাং মিক্ যখন তার কথা শেষ করলো, তখন সে উঠে দাঁড়িয়ে বামনের কথামত কাজ করতে লাগলো। সমস্ত ঠিক হ'লে মিক্ মেঝের উপর বোতলটা রেখে বললো—বোতল, তোমার কাজ কর।

'মা, মা, দেখ',—মিকের পাঁচ বছরের ছোট ছেলে চীৎকার করে উঠলো। দেখা গেল বোতলটা থেকে দুটো ছোট ছোট পরী বেরিয়ে এল। তারপর তারা টেবিলের উপর উঠলো।

মুহূর্তের মধ্যে পরীরা টেবিলের উপর সোনা-রূপোর থালায় মূল্যবান খাবার এনে হাজির করলো। তারপর আবার তারা বোতলের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

কৃষক আর কৃষক-পত্নী অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলো। তারা এমন থালা বা খাবার কখনও চোখে দেখেনি। তাহ'লে সেই বেঁটে মানুষটা সত্যি কথাই বলেছে।

কি সুন্দর জিনিস দেখ, মোলি হাসতে লাগলো, তুমি এসে বসে পড়, তোমার নিশ্চয়ই ক্ষিধে পেয়েছে।

তারা সবাই বসে পেট ভরে খেল, কিন্তু পরীরা যা নিয়ে এসেছিল তার অর্ধেকও শেষ করতে পারলো না। তারা যখন খাওয়া শেষ করলো, তখন মিক্ বললো—পরীরা যদি আবার এগুলো নিয়ে যায়। তারা অপেক্ষা করলো, কিন্তু কেউ আর নিতে এলো না। তখন তারা থালাগুলো রেখে দিয়ে আগুনের পাশে বসে ভাবতে লাগলো—কি করে থালাগুলো বিক্রী করে বড়লোক হবে।

পরদিন মিক্ বাজারে গিয়ে একটা সোনার থালা বিক্রী করে একটা ঘোড়া আর একটা গাড়ী কিনলো। এর পর তারা প্রায় রোজই পরীদের ডাকতো এবং পেট ভরে খেত। এভাবে তাদের সোনা-রূপোর থালার সংখ্যাও বাড়তে লাগলো। এগুলো বাজারে বিক্রী করে মিক্ ক্রমে একজন বেশ বড়লোক হয়ে উঠলো।

একদিন জমিদার মিক্‌কে ডেকে জিজ্ঞাসা করলো, সে কি করে ধনী হ'লো ? মিক্ ছিল খুব সরল মানুষ। সে জমিদারকে সেই বোতল আর পরীর কথা বললো। সব কথা শুনে জমিদারের খুব লোভ হ'লো বোতলটা হাতিয়ে নিতে। জমিদার মিক্‌কে অনেক টাকা দিতে চাইলো বোতলটার বদলে। কিন্তু সে রাজী হ'লো না।

অবশেষে জমিদাদের বললো, আমি তোমাকে আমার সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে দেব, যদি তুমি বোতলটা আমাকে দাও।

আগেই বলেচি মিক্ ছিল খুব সরল আর দিলদরিয়া মেজাজের মানুষ। সে ভাবলো—সত্যই তো আমার আর খুব বেশী বড়লোক হয়েই বা কি হবে? দিয়েই দিই না কেন বোতলটা।

মিক্ বোতলটা জমিদারকে দিয়ে দিল। কিন্তু এমনি তার দুর্ভাগ্য যে, কিছুদিনের মধ্যেই তার সমস্ত টাকা-পয়সা খরচ হয়ে গেল। সে আবার গরীব হয়ে পড়লো। তারপর তার অবস্থা এমনি হ'লো যে, তখন তার একটিমাত্র গরুই সম্বল। বহুদিন আগে যে দুরবস্থায় সে পড়েছিল, সেই-রকম বিপদেই আবার সে পড়লো।

একদিন ভোরবেলা মিক্‌কে আবার দেখা গেল গরুটাকে সঙ্গে করে হাটের পথে যেতে। যাবার পথে মিক্ মনে মনে ভাবলো, যদি সে আবার সেই বেঁটে মানুষটার দেখা পায় তাহলে আর একটা বোতল পেতে পারে। তার ভাগ্য তাহলে আবার ফিরে যাবে।

সে যখন পাহাড়ের কাছে পৌঁছল, তখনও ভাল করে আঁধার কাটেনি। পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট গাছগুলিতে বেশ কুয়াশা জমে রয়েছে। তখনও সূর্য ওঠেনি।

মিক্ যখন পাহাড়ের উপরে উঠলো, তখন সূর্যোদয় হচ্ছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সূর্যোদয় দেখে আর পাখীর গান শুনে মিক্ মনটাকে প্রফুল্ল করলো।

—ওহে মিক্, আমি তোমাকে বলেছিলাম না তুমি বড়লোক হবে—পেছন থেকে যেন কার কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

মিক্ চারধারে তাকিয়ে আবার সেই বামনকে দেখতে পেল। বললো, হ্যাঁ, আমি বড়লোক হয়েছিলাম বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আবার গরীব হয়ে পড়েছি। তোমার যদি আর বোতল থাকে, তাহলে এই গরুটার বদলে সেটা আমাকে দিলে খুশী হব।

লোকটা তার কথা শুনে হেসে কোটের নীচ থেকে আর একটা বোতল

বের করে বললো—এই যে বোতল ! তুমি তো জান কি করতে হয়। বুদ্ধির বলে আবার তুমি বড়লোক হতে পারবে। আচ্ছা বিদায় !

লোকটা মিক্‌কে বোতলটা দিয়ে গরুটা নিয়ে পাহাড়ের আড়ালে চলে গেল। মিক্ বাড়ীর পথে যেতে যেতে ভাবলো—আমার ভাগ্য ভালো যে এই পাহাড় থেকে আমি আবার বোতল পাচ্ছি। আজ থেকে এই পাহাড়কে আমরা সবাই 'বোতল পাহাড়' বলবো।

যাহোক, সে নিরাপদে বাড়ী পৌঁছল। তাকে দেখেই মোলি আনন্দে চীৎকার করে উঠলো।

এক মুহূর্তের মধ্যে সে টেবিলের উপর পরিষ্কার কাপড় বিছিয়ে দিল, ঘরের মেঝে পরিষ্কার করলো। মিক্‌ও বোতলের দিকে চেয়ে বললো—বোতল তোমার কাজ কর।

মিকের কথা শেষ হতেই দুজন লোক দুটো মোটা লাঠি নিয়ে বোতল থেকে বেরিয়ে এলো। কেবল পরীরাই জানে কি করে বোতলের ভেতর তারা বাস করে। যাহোক, লোক দুটা বেরিয়ে এসে মিক্ আর তার স্ত্রীকে মারতে লাগলো—এমন কি তাদের ছেলেমেয়েরাও বাদ গেল না। অবশেষে মিক্ যখন তাদের পায়ে ধরে করুণা ভিক্ষা করলো, তখন তারা বোতলের ভেতরে ঢুকে পড়লো।

আস্তে আস্তে মিক্ উঠে পড়ে স্ত্রী-পুত্রদের মেঝে থেকে ওঠালো। তাদের সারা গায়ে বেশ ব্যথা হয়েছে।

মোলি বললো—তোমার বেঁটে লোকটা তোমাকে আচ্ছা জব্দ করেছে। এই বোতলটাকে ভেঙে ফেলে দাও।

মিক্ বাধা দিয়ে বললো—না, না, আমার বামন-বন্ধু কিন্তু ঠিক কথাই বলেছে। এই বোতলের সাহায্যেই জমিদারকে জব্দ করা যাবে, আর তার কাছ থেকে আমাদের আগের বোতলটাও আদায় করা যাবে।

মিক্ তখন জমিদারের কাছে গেল। জমিদার এখন আগের চেয়ে বেশী বিত্তশালী হয়েছে। প্রচুর তার ধনসম্পদ, কিন্তু সমস্তই ঐ বোতলের কল্যাণে।

মিক্ জমিদারের সঙ্গে দেখা করতে চাইলো। জমিদার তো প্রথমে দেখা করতেই চায় না। অবশেষে মিকের কাছে আরো কিছু লাভের প্রত্যাশায় তার সঙ্গে দেখা করলো।

মিক্ বললে—হুজুর! এবার আমি আগের চেয়ে আরো ভালো একটা বোতল পেয়েছি। আমি তো গরীব লোক। তাই বলছিলাম কি—

জমিদার খুশী চাপতে না পেরে তাকে বাধা দিয়ে বললো—তোমার এ বোতলটাও আমাকে দিতে হবে। আর শোন, আগামী রবিবার আমি আমার সম্ভ্রান্ত বন্ধুবান্ধবদের নেমন্তন্ন করবো। তাদের সামনে আমি তোমার বোতলের কসরৎ দেখাবো। সুতরাং তুমি সেদিনই বোতলটা দেবে, তার বদলে আমি তোমাকে প্রচুর টাকা-পয়সা দেব, বুঝেছ?

মিক্ বললো—হ্যাঁ, বুঝেছি। আমি ঠিক ঐ দিন ঐ সময়ে বোতলটা আপনাকে দেব।

'আচ্ছা এখন তুমি যেতে পার'—এই বলে জমিদার তখন মিক্‌কে বিদায় করলো।

রবিবারে জমিদারের বাড়ীতে বেশ বড় ভোজের আয়োজন করা হয়েছে। আগের বোতলের দৌলতে খাবার-দাবারের কোনও অসুবিধা নেই।

মিক্ জমিদারকে নতুন বোতলটা এনে দিল। জমিদার তখন সমস্ত নিমন্ত্রিত লোকের সামনে বোতলটাকে ঠিকমত সাজিয়ে বললো—'বোতল, তোমার কাজ কর।'

বোতলের মধ্যে থেকে তখন দুটো লোক লাঠি নিয়ে বেরিয়ে এলো। তারা জমিদার এবং উপস্থিত অপর সকলকে মারতে সুরু করলো। সকলে চীৎকার করতে লাগলো; আর দূরে দাঁড়িয়ে মিক্ মজা দেখতে লাগলো।

জমিদার তখন মিকের পায়ের কাছে এসে বললো—মিক্, তুমি আমাদের বাঁচাও বাবা! তোমাকে আমি প্রচুর ধনসম্পত্তি দেব। মিক্ হেসে বললো—তুমি যদি আমাকে আমার আগের বোতলটা ফিরিয়ে দাও, তাহলে আমি ওদের কোনরকমে শান্ত করতে পারি। নইলে আমার আর কিছু করবার নেই।

ব্যাপার বেশ সুবিধার নয় দেখে জমিদার প্রাণ বাঁচাবার জন্য আগের বোতল ফিরিয়ে দিলে।

মিক্ লোক দুটোর কাছে করুণাভিক্ষা করবার পর তারা বোতলের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

তারপর মিক্ দুটো বোতলের মালিক হয়ে পরমসুখে বাস করতে লাগলো। দেশের মধ্যে সে একজন বিখ্যাত লোক হয়ে পড়লো—তাকে কোনদিন আর অভাবে পড়তে হয়নি। আর সেই বোতল পাহাড়ের কথা লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগলো।

পুরস্কার

(চীনা উপকথা)

চীনাদের বিশ্বাস, উপরে আকাশে মেঘের রাজ্যে সব দেব-দেবীরা বাস করেন। এই দেবদেবীর মধ্যে একজন দেবতা ছিলেন ফো। তিনি চীনদেশের লোকের দয়া, ভালবাসা, দান, ধ্যান ইত্যাদির কথা অনেক শুনেছিলেন। অবশেষে তিনি একদিন মনস্থ করলেন, পৃথিবীতে গিয়ে দেখে আসবেন, ঐসব কথা সত্যি কি-না।

পৃথিবীতে পেঁাছবার জন্য তিনি মেঘকে আদেশ দিলেন। মেঘ তাঁকে নিয়ে নামিয়ে দিল চীনদেশের মাটিতে। দেবতা ফো তখন বৃদ্ধ ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে একটা লাঠির ওপর ভর দিয়ে নিকটবর্তী গ্রামের দিকে চললেন।

গ্রামে গিয়ে এক বাড়ীর দরজায় আঘাত করলেন। একজন স্ত্রীলোক দরজা খুলে দিলে ভিক্ষুকবেশী দেবতা ফো বললেন, আমি বড় ক্লান্ত আর আমি ঠাণ্ডায় একেবারে জমে গিয়েছি। আমাকে কি ভেতরে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করতে দেবেন ?

—নিশ্চয়ই। ভিতরে এস—স্ত্রীলোকটি মধুরস্বরে উত্তর করলো। বৃদ্ধ লোকটি তখন ঘরের ভিতর প্রবেশ করলেন। সেই স্ত্রীলোকটি ছিল এক গরীব মেয়ে-দর্জি। গরীব হলেও সে আগন্তুককে ভালো করে খেতে দিল এবং ঘরের কোণে আগুনের পাশে তার বসবার ব্যবস্থা করে দিল।

বৃদ্ধ লোকটি যখন খাচ্ছিল, তখন স্ত্রীলোকটি লক্ষ্য করলো যে, তার কোটটি খুব ছেঁড়া। সে লোকটিকে বললো, কোটটা আমাকে খুলে দাও, আমি ভালো করে সেলাই করে দিচ্ছি। সেলাই করতে আরম্ভ করে সে দেখলো, কোটটা এতই পুরাতন যে, আগের ছেঁড়া সেলাই না করতে না করতেই আবার নতুন জায়গা ছিঁড়ে যাচ্ছে।

—এটাকে আর মেরামত করে কোন লাভ নেই, আমি তোমাকে একটা নতুন কোট তৈরী করে দিচ্ছি।—এই বলে সে তার কাছে যে কাপড় ছিল, তা থেকে সেই বৃদ্ধ ভিক্ষুকের জন্য একটা কোট কেটে তাড়াতাড়ি সেলাই করতে লাগলো।

কিন্তু সেলাই করবার সময় তার সূঁচটা মনে হলো যেন উড়ে চলেছে। দিন শেষ হয়ে এলো, কিন্তু কোটটা শেষ হতে তখনও অনেক বাকী। সে লোকটাকে বললো, তোমাকে রাত্রে এইখানেই থাকতে হবে। আমি তোমার নতুন কোটটি সকালের আগে শেষ করতে পারবো না। তোমাকে শোবার বিছানা করে দিচ্ছি।

বৃদ্ধ লোকটি কোন কথাই বললো না। কিন্তু বিছানা তৈরী হলে সে শুয়ে পড়লো এবং সকাল না হওয়া পর্যন্ত বিছানা থেকে উঠলো না।

এদিকে সারারাত ধরে স্ত্রীলোকটি কাজ করলো। সেলাইয়ের শেষ ফোঁড়টি যখন শেষ হলো তখনই ভোর হয়েছে। লোকটা জেগে উঠলে, তার নতুন তৈরী কোটটি সে তাকে দিল। আর কিছু ভালো খাবার তার সামনে এনে দিয়ে বললো—ভালো করে খাও, তারপর তোমার কাজে যেতে পার। এখন আর ঠাণ্ডা, বৃষ্টি তোমাকে বিশেষ কাবু করতে পারবে না।

খাওয়া শেষ করে বৃদ্ধ ভিখারীটি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে যেতে মনস্থ করলো। কিন্তু দরজার কাছে এসে পেছনে তাকিয়ে সে বললো, আমি চলে যাবার পর তুমি যে কাজ প্রথমে আরম্ভ করবে, সূর্য অস্ত যাবার পূর্ব পর্যন্ত সে কাজ হতে বিরত হবে না।

--এই কথা বলেই লোকটা পথে নেমে পড়ল।

লোকটা দৃষ্টির আড়ালে চলে যাবার পর স্ত্রীলোকটি নিজের ঘরে এসে তার দৈনন্দিন কাজ সুরু করল। সে ভাবলো, বুড়ো লোকটার কোটের কাপড় কাটার পর কত কাপড় বেঁচেছে, তা দেখতে হবে।

একথা মনে হতেই প্রতিদিনের মত ঘর পরিষ্কার এবং রান্না না করে, সে কাপড় মাপতে আরম্ভ করলো।

আমি যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে বেশী কাপড়ই বেঁচেছে—স্ত্রীলোকটি

কাপড় মাপতে মাপতে মনে মনে বললো। সে সেই কাপড় মাপতেই লাগলো, কিন্তু কাপড় মেপে আর শেষ হয় না।

ক্রমে ক্রমে সব ঘরটা কাপড়ে ভরে গেলো। স্ত্রীলোকটি না থেমে, কাপড় মাপতে লাগলো, কিন্তু তখনও অনেক কাপড় মাপতে বাকী রইলো।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যায়—কাপড় এতই স্তূপীকৃত হলো যে, তার দাঁড়াবার জায়গা পর্যন্ত রইলো না। কিন্তু সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত সে কাপড় মাপতেই লাগলো। দিনের শেষে তার কাপড় মাপাও শেষ হয়ে গেল।

স্ত্রীলোকটি তখন মাপকাঠি ছুঁড়ে ফেলে, ঘরের বাইরে দৌড়ে গিয়ে একজন প্রতিবেশিনীকে ডেকে বললো—এস, এস, আমার কত কাপড় দেখে যাও। আমার এত কাপড় আছে যে, আমি একজন বেশ বড় ধনী হতে পারি।

প্রথমে প্রতিবেশিনী তার কথা বিশ্বাস করলো না, কিন্তু যখন সে তার ঘরের চারধারে কাপড়ের স্তূপ দেখলো, তখন তার বেশ হিংসা হলো। সে বললে, কি করে এগুলো পেলে ?

সব শুনে প্রতিবেশিনী ভাবলো, তার মত কাজ করলে আমিও ধনী হবো না কেন ? এটা মোটেই ভালো নয় যে, তার অনেক কাপড় থাকবে আর আমার কিছুই হবে না।

প্রতিবেশিনী তখনই সেই বৃদ্ধ ভিক্ষুকের খোঁজ করতে লাগলো। একদিন সে তার দেখাও পেলো। আগের মতই ছদ্মবেশী বৃদ্ধ ভিক্ষুকটি দেবতা ফো স্বয়ং। তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন মানুষের দয়া-ধর্ম পরীক্ষার জন্য। আগের সেই সৌভাগ্যবতী স্ত্রীলোকের এক হিংসুক প্রতিবেশিনীর গৃহদ্বারে এসে ভিখারী আঘাত করলো। সে বললো,—আমি বড় ক্লান্ত, আমি কি ভেতরে গিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে পারি ?

স্ত্রীলোকটি বললো,—হ্যাঁ, ভিতরে এসো। এখানে বিশ্রাম করতে পারো। তাছাড়া, আমি তোমাকে খাবার দিচ্ছি। আমার চেয়ে যারা

গরীব তাদের আমি সব সময় তাদের যথাসাধ্য উপকার করি। এই বলে সে দরজা খুলে দিলো।

তারপর সে খাবার প্রস্তুত করলো। সে নিজে যা খায় তা কিন্তু তাকে দিল না। নিজের খাবারের উচ্ছিষ্ট সে লোকটাকে খেতে দিল।

যখন লোকটা এই খারাপ খাবার খেতে আরম্ভ করছে, তখন স্ত্রীলোকটি বললো—আমি দেখছি, তোমার কোটটা খুব ছিঁড়ে গিয়েছে। দাও, আমি ওটা মেরামত করে দিই।

বৃদ্ধ লোকটি তার কোটটি স্ত্রীলোকটিকে দিল। স্ত্রীলোকটি কোটটা হাতে নিয়ে ভাবলো, এই লোকটাকে সন্তুষ্ট করা খুবই সহজ। আর আমি বাস্তবিকই ভাবতে পারছি না, লোকটার কোট খরচ ও পরিশ্রম করে কেন নতুন করে তৈরী করে দিতে হবে। এই কোটটার ছেঁড়াগুলো সেলাই করে দেব। মনে হয়, তাতেই ও সন্তুষ্ট হবে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতেই সুরু হলো ঝড় আর বৃষ্টির উন্মাদ নৃত্য। স্ত্রীলোকটি বললো, আজ এখানেই থাক। রাত্রের এখানে থাকার জায়গা আমি তোমাকে দিচ্ছি। স্ত্রীলোকটি বৃদ্ধ লোকটির জন্য সুন্দর বিছানার বদলে ঘরের বাইরে একটা শক্ত মাতুরের উপরেই শোবার জায়গা করে দিল।

সকালে স্ত্রীলোকটি অনেক ভাল ভাল কথাই তাকে বললে। কিন্তু কিছুই তাকে খেতে দিল না। সুতরাং বৃদ্ধকে ক্ষুধার্ত হয়েই যেতে হলো। এসব সত্ত্বেও সে চলে যাবার সময় স্ত্রীলোকটিকে বললো, আমি যাবার পর তুমি যে কাজে হাত দেবে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে কাজ থেকে বিরত হবে না।

লোভী স্ত্রীলোকটি ভাবলো, সে অল্পেই সব কিছু পেলো। লোকটা দরজার পাশে অদৃশ্য হতেই সে দৌড়ে গিয়ে মাপকাঠি খুঁজতে লাগলো —যাতে সে তার প্রতিবেশীর মত কাপড় মেপে পায়।

ঠিক এই সময়ে তার শূকর ছানাগুলো খুব চীৎকার সুরু করলো। স্ত্রীলোকটি অস্ফুটস্বরে বলে উঠলো, অসহ্য। বোধহয় ওরা জল চায়। জল না পেলে সারাদিন চেঁচাবে। ওগুলোকে জল দিয়ে এসে কাপড় মাপাই ঠিক। কেননা, একবার মাপতে আরম্ভ করলে আর থামা যাবে না।

সে একটা বালতি নিয়ে শূকরছানার জন্য জল আনতে গেল। কিন্তু একবার জল ঢেলে দেখলো, সে কিছুতেই সেটা ছাড়তে পারছে না।

কাপড় মাপার বদলে তাকে সারাদিন জলই ঢালতে হলো। অল্প সময়ের মধ্যেই মেঝেতে জল দাঁড়িয়ে ঘরের সমস্ত জিনিসই ভাসতে লাগলো।

তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে জল সামনের রাস্তা ডুবিয়ে দিল। ক্রমে ক্রমে জল অন্যান্য বাড়ীর ভেতর ঢুকতে লাগলো এবং দুপুরের মধ্যেই সেই ছোট গ্রামটি জলে ডুবে গেল। প্রথমে প্রতিবেশীরা সেই স্ত্রীলোকটিকে আর জল ঢালতে মানা করলো। কেউ ওকে অনুরোধ করলো, আর কেউ বা করলো তিরস্কার। কিন্তু তাতে কোন ফলই হলো না। সে বালতি আর ছাড়তে পারলো না।

অবশেষে গ্রামের সব লোক নিকটবর্তী নগররক্ষীদের কাছে খবর পাঠালো। দু ঘণ্টা পরে ছয় জন লম্বা নগররক্ষী সেই স্ত্রীলোকটির বাড়ীতে এলো। তাদের পিছনে গ্রামের সমস্ত লোক ভেঙে পড়লো।

পাঁচজন নগররক্ষী দরজায় দাঁড়িয়ে রইলো। একজন জলের মধ্য দিয়ে পথ করে সেই স্ত্রীলোকটির কাছে গেল। সে তাকে বললো, তুমি এখনই জল ঢালা বন্ধ কর। আমরা তোমাকে কারাগারে নিয়ে যেতে এসেছি।

স্ত্রীলোকটি উত্তর দিল, আমি কিন্তু বন্ধ করতে পারছি না।

নগররক্ষী গম্ভীরকণ্ঠে বললো, তুমি অবশ্যই বন্ধ করবে। তার কথা শেষ হবার পরই সূর্য পশ্চিমের পাহাড়ের নীচে ডুবে গেল। স্ত্রীলোকটিও জল ঢালা বন্ধ করলো।

নগররক্ষী বললো—দেখ, আমি ঠিক কথাই বলেছি কিনা। এখন তুমি আমার সঙ্গে কারাগারে চলো।

স্ত্রীলোকটিকে কারাগারে যেতে হয়েছিল। কুড়ি দিন পরে সে ছাড়া পায়। বাড়ী এসে সে বুঝতে পারলো, লোভী হওয়া ভালো নয়।

অকৃতজ্ঞ

(আইসল্যাণ্ডের উপকথা)

একজন লোক তার শ্লেজগাড়ী নিয়ে প্রায়ই বনে যেত জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে। একদিন হঠাৎ তার সঙ্গে এক ভালুকের দেখা।

ভালুক বললো, তোমার গাড়ী থেকে ঘোড়াটা ছেড়ে দাও, না দিলে আগামী গ্রীষ্মকালের মধ্যে তোমার সব ভেড়া মেরে ফেলবো।

লোকটা ভালুকের কথায় ভয় পেয়ে বললো—আমাকে আজ এসব জ্বালানী কাঠ বাড়ী পৌঁছে দিতে দাও। তারপর কাল সকালে ঘোড়াটা তোমাকে দিয়ে যাব। লোকটার কথায় ভালুক রাজী হলো।

লোকটা পথে যেতে যেতে এক শেয়ালের দেখা পেলো। শেয়াল তাকে দেখে বললো, ওহে, তোমাকে যে বড়ই বিষণ্ণ দেখাচ্ছে, ব্যাপার কি ?

লোকটা বললো, সে কথা আর বলো না ভাই। বনের ভিতর এক ভালুকের সঙ্গে দেখা। তাকে আমার এই ঘোড়াটা কালই দিয়ে দিতে হবে। না দিলে সে বলেছে, সে আমার সব ভেড়াকে খেয়ে ফেলবে।

শেয়াল বললো, ওহো তাই নাকি ? আচ্ছা, আমাকে যদি তোমার সবচেয়ে মোটা ভেড়াটা দাও, তাহলে আমি তোমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারি।

ঘোড়ার বদলে ভেড়া দিয়ে যদি উদ্ধার পাওয়া যায়, তাহলে ক্ষতিটা কিছু কম হয় ; সুতরাং লোকটা শেয়ালের কথায় রাজী হলো।

—বেশ, তাহলে কাল সকালে যখন তুমি ভালুকের জন্য ঘোড়া নিয়ে আসবে, তখন আমি দূর থেকে পাথরের স্তূপে ঘর্ ঘর্ শব্দ করবো। শব্দটা কিসের ভালুক তা জিজ্ঞেস করলে, তুমি বলবে—ওদিকে পিটার নামে

এক লক্ষ্যভেদী আছে। তার মত শিকারী পৃথিবীতে আর নাই। তার পরের কাজ আমার হাতে।

শেয়ালের কথায় সন্তুষ্ট হয়ে লোকটি বাড়ী চলে গেল। পরদিন লোকটা ঘোড়া নিয়ে বনের দিকে চললো। সেখানে সেই ভালুকের সঙ্গে তার দেখা। হঠাৎ কিছু দূরে একটা ভীষণ ঘর্ ঘর্ শব্দ শোনা যেতে লাগলো।

হিস্! ওটা কিসের শব্দ?—ভালুক জিজ্ঞাসা করে।

লোকটা বললো, ওঃ! ও হচ্ছে পিটার নামে এক লক্ষ্যভেদী, সে জগতে শ্রেষ্ঠ শিকারী। আমি তার গলার স্বর শুনেই চিনেছি।

লোকটার কথা শেষ হতেই বনের ভিতর থেকে একটা গলার স্বর এলো ভেসে, ওহে, তুমি কোন ভালুক-টালুক এদিকে দেখেছ নাকি?

ভালুক ভয় পেয়ে নীচু গলায় লোকটাকে বললো—বল যে, কেই নাই। ভালুকের কথামত লোকটা বললো—না, আমি কাউকে দেখিনি।

তাহলে তোমার ঐ গাড়ীর পাশে কে দাঁড়িয়ে?—আবার কণ্ঠস্বর শোনা যায় বনের দিক থেকে।

ভালুক শিখিয়ে দেয়—বলো, ওটা একটা গাছের গুঁড়ি।

লোকটা ভালুকের কথার প্রতিধ্বনি করে বললো, ও, এটা একটা মরা দেবদারু গাছের গুঁড়ি।

অদৃশ্য কণ্ঠ তখন বললো, আমরা দেশে এসব গাছের গুঁড়ি কুঠার চালিয়ে কেটে থাকি।

একথা শুনে ভালুক খুব ভীত হয়ে লোকটাকে বললো, বড় বিপদেই পড়লাম তো। তুমি এখন আমার গায়ে কুঠার মারার ভান কর।

লোকটা তখন মনে মনে হেসে তার কুঠার দিয়ে ভালুকের গায়ে এমন জোরে আঘাত করলো যে, ভালুক সেই এক আঘাতেই মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

শেয়াল তখন তার গুপ্তস্থান থেকে বেরিয়ে এসে বললো, আমি এখানে অপেক্ষা করছি। তুমি তো বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে গেলে। বাড়ী গিয়ে

আমার জন্য এখন ভেড়াটি নিয়ে এসো। কিন্তু মনে রেখো সবচেয়ে সুন্দর আর মোটা ভেড়াটি আমার চাই।

লোকটা তখন ঘোড়া নিয়ে বাড়ী চলে এলো। তারপর ভেড়াগুলো যেখানে থাকে সেদিকে চললো। তার স্ত্রী তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলো, এভাবে অসময়ে ওদিকে চললে যে?

লোকটা তখন মোটামুটি সব ঘটনাটা জানালো। সে বললো, আমাদের ঘোড়াটা যে উদ্ধার করে দিয়েছে, সেই শেয়ালের জন্য এখন একটা ভেড়া আনতে যাচ্ছি।

তার স্ত্রী একথা শুনে বললো, ভেড়া! কখনই না। তার চেয়ে ছুটো কুকুর একটা থলের ভেতর নিয়ে শেয়ালের সামনে ছেড়ে দাও।

স্ত্রীর উপদেশ গ্রহণযোগ্য মনে করে, সে একটা ঝোলায় ছুটো তেজী কুকুর নিয়ে শেয়ালের কাছে গেল।

শেয়াল জিভ্ চেটে জিজ্ঞাসা করলে, সুন্দর আর মোটা ভেড়াটি এনেছ তো?

হ্যাঁ, এই যে নাও। বলেই, লোকটা ঝোলার মুখ খুলে কুকুর ছুটোকে ছেড়ে দিল।

শেয়াল তো ব্যাপার দেখে চীৎকার করে লাফিয়ে উঠলো! কুকুর ছুটো শেয়ালের পেছনে ছুট্‌লো আর কুকুরও প্রাণের দায়ে দৌড় দিল। শেয়াল মনে মনে বললো, লোকগুলো আচ্ছা অকৃতজ্ঞ তো! আমি এখন বুঝেছি, অনেক সময় ভালো কাজ করেও মন্দ ফল পেতে হয়।

প্রতিধ্বনির জন্মকথা

(গ্রীক উপকথা)

বর্তমান যুগে কেবল ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাই পরী বিশ্বাস করে। কিন্তু প্রাচীনকালে বয়স্ক অনেক লোকই এসব বিশ্বাস করতো। আর এ সম্বন্ধে প্রচলিত গল্পগুলো তারা সত্য বলেই মনে করতো।

ফাঁকা ও নির্জন জায়গায় তুমি যদি চীৎকার করে কোন কথা বল, তাহলে তোমার কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাবে। এই প্রতিধ্বনির সম্বন্ধে গ্রীসদেশে একটা খুব সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে।

সেকালে 'একো' অর্থাৎ প্রতিধ্বনি নামে এক পরমাসুন্দরী মেয়ে ছিল। সে হেসেখেলে খুবই সুখে দিন কাটাচ্ছিল। কিন্তু তার একটা দোষ ছিল—সে খুব বেশী কথা বলতো।

জুনো নামে এক দেবী একদিন ভাবলেন, প্রতিধ্বনিকে শাস্তি দিতে হবে। সে সব সময় অনর্গল বাজে কথা বকে। এই ভেবে তিনি 'একো' অর্থাৎ প্রতিধ্বনিকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, তুমি তোমার কণ্ঠকে এতবেশী ব্যবহার করেছ যে, আমি ওটাকে বিশ্রাম দিতে চাই। এখন থেকে তুমি যা শুনবে, কেবলমাত্র তার শেষ বা শেষ দুটো অক্ষর উচ্চারণ করতে পারবে।

প্রতিধ্বনি তাঁর দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে বললো, করতে পারবে!

রাণী জুনো তাঁর অভিশাপের ফল ফলেছে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি বুঝেছ? সে কেবল বললো, বুঝেছ।

বেচারী প্রতিধ্বনি! সে বনের ভিতর গিয়ে একলাই খেলা করে বেড়াতে লাগলো। সে গাছের পিছনে লুকিয়ে রইলো। সে যে সব কথা শুনতে পাচ্ছিলো, তার শেষ কথাই সে উচ্চারণ করতে পারছিল।

একদিন সে এক যুবককে তীর-ধনুক হাতে সেই বনের ভিতর দেখলো। যুবকটি খুবই বলবান্। আর তাকে দেখে বেশ সুখী বলেই মনে হলো। প্রতিধ্বনি যুবককে খুবই ভালবেসে ফেললো। সে যুবকের সঙ্গে কথা বলতে চাইলো, কিন্তু নিজে তার দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে থাকলো। কেননা, তার ইচ্ছে ছিল না যে অন্য কেউ জানুক, সে কথা বলতে পারে না।

শিকার লক্ষ্য করে যখন যুবক তীর ছুঁড়লো, তখন প্রতিধ্বনি গাছের আড়াল থেকে উঁকি দিল। তারপর যুবক বনের ভিতর দিয়ে দৌড়ে চলল। সেও তার পিছনে পিছনে চললো, কিন্তু সব সময়ই যুবকের দৃষ্টির বাইরে রইলো।

কিছুক্ষণ পরে যুবক খুঁজতে লাগলো তার অন্যান্য বন্ধুদের। তারা সব এক সঙ্গেই শিকারে বেরিয়েছিলো। সে চীৎকার করে বললো—তোমরা কোথায় ?

একথায় কাছেই সুমিষ্ট গলার উত্তর এলো—কোথায় ?

যুবক আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলো—ওখানে কে আছে ?

কে আছে ?—প্রতিধ্বনি উত্তর করলো।

যুবক কিছু বুঝতে না পেরে আবার বললো—আমাকে বল, তুমি কে ?

তুমি কে ?—উত্তর ফিরে এলো।

তারপর যুবক গাছের আশ-পাশে এমন কি ডালপালা পর্যন্ত খুঁজে দেখলো, কিন্তু যুবক কাউকে দেখতে পেলো না। তখন সে বললো—দয়া করে আমাকে দেখা দাও।

উত্তর এলো—দেখা দাও।

প্রতিধ্বনি আর নিজেকে গোপন রাখতে পারলো না।

আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে সে যুবকের সামনে দাঁড়ালো। মন তার দুঃখে ভারাক্রান্ত, কারণ যুবকের প্রতি তার ভালবাসা সে কথায় প্রকাশ করতে পারছিলো না। কেবল যুবকের সামনে এসে দাঁড়িয়ে রইলো।

এদিকে এই যুবকটি এ পর্যন্ত কাউকে ভালবাসতে পারেনি। প্রতি-

ধ্বনির প্রতিও তাই সে সদয় ব্যবহার করলো না। সে তার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে, তার বন্ধুদের খুঁজতে চলে গেল বনের অন্যদিকে।

যুবকের এ ব্যবহারে প্রতিধ্বনি খুব মর্মাহত হয়ে গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইলো, যাতে আর কেউ না তাকে দেখতে পায়।

সে সেই সুন্দর যুবকের কথা চিন্তা করতে করতে শীর্ণ হয়ে গেল। ক্রমশঃ সে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়ে অনাহারেই দিন কাটাতে লাগলো। কিন্তু সব সময় নিজেকে সে লুকিয়ে রাখলো। এভাবে একদিন প্রতিধ্বনি মৃত্যুমুখে পতিত হলো।

তার দেহ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, কিন্তু রয়ে গেল তার কণ্ঠস্বর। তাই এখনো নির্জন স্থানে চীৎকার করলে বা একলা জোরে কথা বললে তার প্রতিধ্বনি আসে ফিরে।

আহ্মদ মুচির গল্প

(পারস্য উপকথা)

পারস্যের কোন এক বড় শহরে আহ্মদ নামে এক মুচি বাস করতো। আহ্মদ লোকটি ছিল খুব সৎ। সে কঠোর পরিশ্রম করতো এবং তার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল সুখ আর শান্তিতে বাস করা। এজন্য সে ছিল অল্পেই সন্তুষ্ট।

কিন্তু তার স্ত্রী ছিল স্বামীর উল্টো। সে চাইত বড়লোক হতে, সুন্দর পোশাক পরতে, আর জাঁকজমকের মধ্যে জীবন কাটাতে।

একদিন আহ্মদের স্ত্রী বহুমূল্য পোশাকপরিহিতা, অলংকার-ভূষিতা এক মহিলাকে শহরের কোন এক বড় বাড়ীতে ঢুকতে দেখলো। মনে মনে সে ভাবলো, মেয়েটি কে, তা জানতে হবে। ও কি করে বড়লোকের স্ত্রী হল? মুচির স্ত্রী সেই বাড়ীর দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলো, ঐ মহিলাটি হচ্ছেন রাজজ্যোতিষীর স্ত্রী।

স্ত্রী বাড়ী ফিরলে স্বামী নিজের স্বভাবসিদ্ধ হাসিমুখে তার কাছে এলো। এসে জিজ্ঞাসা করলো, সে এতক্ষণ কোথায় ছিল আর সময়টা তার ভালো কেটেছে কিনা। উত্তরে স্ত্রী কেবল ভ্রূকুটি করলো, কোন কথাই বললো না।

মুচি তখন তার স্ত্রীকে খুশী করবার জন্য নানাকথা বলতে লাগলো। কিন্তু তাতে কোন ফলই হলো না। অবশেষে তার স্ত্রী বললো, হ্যাঁ, আমি বুঝেছি, তুমি কি বলতে চাও। তুমি বলতে চাও যে, আমি তোমাকে ভালবাসি ; কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমাকে তার কোন প্রমাণ না দিচ্ছ, আমি কি করে জানবো যে, তুমি সত্যি কথা বলছো ?

আহ্মদ বললো, কি প্রমাণ দেব বল ?

তার স্ত্রী তখন বললো, তাহলে তুমি তোমার মুচির কাজ ছেড়ে দাও।

এ কাজ অতিশয় ঘৃণ্য। আর তা ছাড়া, আমাকে সন্তুষ্ট করতে যে টাকার দরকার, সে টাকা তুমি একাজ করে উপার্জন করতে পারবে না। মুচির কাজ ছেড়ে তুমি জ্যোতিষী হও। গ্রহ, নক্ষত্র সম্বন্ধে পড়াশোনা করে লোকের ভবিষ্যৎ গণনা কর। তাহলে তোমার ভাগ্যও শীঘ্র ফিরবে, আর আমিও ধনী এবং সুখী হতে পারবো।

জ্যোতিষী! তুমি কি বলতে চাও?—আহ্‌মদ চীৎকার করে বলে। তুমি কি জান না যে, জ্যোতিষী হতে গেলে বিদ্বান্ হওয়া চাই? আমি মূর্খ এক মুচি। একজন জ্যোতিষীর যা জানা দরকার, তা আমি কি করে জানবো?

মুচির স্ত্রী বললো, আমি ওসব কিছু জানি না। দেখ, তুমি যদি আমার কথামত কাজ না কর, তাহলে আমি আজ থেকে এখানে থাকবো না।

স্ত্রী আহ্‌মদকে গণক হতে অবশেষে রাজী করালো।

আহ্‌মদ তার ব্যবসা ছেড়ে দিতে চায়নি। কিন্তু সে তার স্ত্রীকে খুব ভালবাসতো। সুতরাং তার জন্য সে সঞ্চিত চামড়া এবং যন্ত্রপাতি বিক্রী করে দিল। সেই টাকায় গণক হতে গেলে যে-সব জিনিসের দরকার, সে-সব কিনলো। তারপর সে বাজারে গিয়ে একটা ছোট টেবিল পেতে চীৎকার করে বলতে লাগলো, আমি একজন জ্যোতিষী—চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্র সম্বন্ধে আমি সব কিছুই জানি। আমি সকলের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান গুণে বলতে পারি।

এদিকে এই মুচি শহরের মধ্যে বেশ পরিচিত ছিল। সুতরাং শীঘ্রই তাকে ঘিরে একটা ভিড়ের সৃষ্টি হলো। সকলে তাকে বোকা ও বিকৃত-মস্তিক ভেবে উপহাস করতে লাগলো।

এদিকে যখন আহ্‌মদ তার টেবিল সাজিয়ে বসেছিল, তখন রাজার মণিকার সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলো। তখন মণিকার খুবই বিপদগ্রস্ত ও চিন্তাকুল। রাজার মুকুটের একটা বড় মণি সে হারিয়ে ফেলেছে। সে জানতো, মণিখানা না পেলে তার মাথা থাকবে না। সে সমস্ত নগরে খোঁজ করলো, কিন্তু কোথাও তার হারানো জিনিস পেলো না।

বাজারের এই ভিড় দেখে মণিকার একজনকে ব্যাপার কি, তা জিজ্ঞাসা করলো। এ হচ্ছে আহ্‌মদ মুচি,—একটা লোক হাসতে হাসতে বললো, —সে একজন দৈবজ্ঞ হয়েছে, সে মনে করে যে, সে গ্রহ-নক্ষত্রের ফলাফল জানে।

একজন ডুবন্ত লোক বাঁচবার জন্য একটা খড়ের কুটাও আঁকড়ে ধরে। সুতরাং সেই মণিকার 'দৈবজ্ঞ' এই কথাটি শুনেই আহ্‌মদের কাছে গিয়ে বললো, আপনি রাজার মণিটি খুঁজে দিন। খুঁজে দিতে পারলে আমি আপনাকে দুশো মোহর দেব, কিন্তু অকৃতকার্য হলে আপনার গর্দান যাবে। আমি আপনাকে মাত্র ছয় ঘণ্টা সময় দিলাম। এর মধ্যে আপনাকে বলতে হবে, কোথায় সেই মণিটা আছে।

গরীব আহ্‌মদ কি করতে হবে কিছুই জানতো না। তার স্ত্রী তাকে যে কি ভাবে সঙ্কটে ফেলেছে, এই কথা ভেবে সে চীৎকার করে বললো, হে নারী! তোমার কাজ মরুভূমির ড্রাগনের চেয়েও বেশী ক্ষতিকর।

এদিকে রাজার মুকুটের মণি চুরি করেছিল জহুরীরই স্ত্রী। তার স্ত্রীর একজন চাকর আহ্‌মদের পাশে সেই ভিড়ের মধ্যেই ছিল। যখন সে আহ্‌মদকে ঐকথা বলতে শুনলো, তখন সে দৌড়ে বাড়ী গিয়ে প্রভুপত্নীকে বললো, একজন নতুন জ্যোতিষী এই শহরে এসেছে, সে জানতে পেরেছে, রাজার মুকুট থেকে মণি আপনিই নিয়েছেন।

একথা শুনে জহুরীর স্ত্রী কি করতে হবে বুঝতে না পেরে দ্রুতবেগে বাজারের ভিতর আহ্‌মদের কাছে গেল। সে আহ্‌মদের পায়ের তলায় পড়ে কাঁদতে লাগলো, আমাকে বাঁচান। আমার সম্মান আর জীবন বাঁচালে আমি সব কথাই আপনাকে বলব।

আহ্‌মদ আশ্চর্য হয়ে বললো, কি হয়েছে বলুন তো? সে উত্তরে বললো, আপনি সবই জানেন। আপনি জানেন যে, আমিই রাজার মুকুট থেকে মণি চুরি করেছি। আমি বড়লোক হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এখন বুঝেছি, এটা বড় অন্যায় কাজ; সেজন্য আমি আপনার করুণা ভিক্ষা করি।

মণিকারের স্ত্রী সব কথা বলতে আহ্মদ আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। কিন্তু আনন্দ গোপন রেখে সে কঠোর ভাষায় বললো, আমি জানি আপনি কি করেছেন। বেশী দেরী হবার আগেই আপনি আমার কাছে দোষ স্বীকার করে ভাল করেছেন। তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়ে যে আসনে আপনার স্বামী বসেন, মণিটি তারই নীচে রেখে দিন, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

জহুরীর স্ত্রী বাড়ী গিয়ে আহ্মদের কথামত কাজ করলো। তারপর সে তার স্বামীর আগমন প্রতীক্ষায় রইলো।

কিছুক্ষণ পরে সেই মণিকার আহ্মদের কাছে গেল। আহ্মদ তাকে বললো, আমি চন্দ্র সূর্যকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পেরেছি যে, তোমার হারানো মণিটা তোমার বসবার আসনের নীচে আছে। বাড়ী গিয়ে সেটা দেখে নাও।

মণিকার ভাবলো যে, আহ্মদ বিকৃতবুদ্ধি-সম্পন্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। তবুও, সেকথাটা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারলো না; বাড়ী গিয়ে সে আসনের তলায় আহ্মদের কথামত সত্যসত্যই মণিটা পেলো।

কৃতজ্ঞতায় সে আহ্মদের কাছে দৌড়ে গেল এবং দুশো মোহর তাকে পুরস্কার দিলে।

আহ্মদ যখন দেখলো যে, সামনের মোহরগুলি সব তারই নিজের, তখন সে সেগুলো নিয়ে বাড়ী গেল।

আহ্মদের স্ত্রী তাকে আসতে দেখে বাড়ীর দরজায় গিয়ে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলো, কি, সাফল্য লাভ করলে?

আহ্মদ দুশো মোহর বের করে বললো, এই যে, তুমি এগুলো নাও। এখন তাহলে তুমি সুখী হবে আর আমিও আমার মুচির কাজ করে জীবন কাটাবো। জীবনের দায়িত্ব নিয়ে আমি আর একাজ করছি না।

কিন্তু তার স্ত্রী স্বর্ণমুদ্রার স্তূপ দেখে ভাবলো, এগুলো আরো পেলে কত ভালো হয়? সে তার স্বামীকে মধুর স্বরে বলতে লাগলো, তোমার সাহস থাকা চাই। তুমি যখন প্রথম দিনেই ভালো উপার্জন করেছ, তখন

না জানি আমরা কত বড় লোকই না হবো! সুতরাং ভয় না পেয়ে এই কাজেই অগ্রসর হও।

আহ্‌মদ বলতে চেষ্টা করলো—সে সামান্য একজন মুচি, আর নতুন কাজে আজ সে ভীষণ বিপদেও পড়েছিল। কিন্তু তার স্ত্রী সেকথা শুনলো না। সে কেঁদে অনুরোধ করে বললো, সে যেন অন্তত আর একদিনের জন্যও গণকের কাজ করে।

এদিকে আহ্‌মদ তার স্ত্রীকে খুব ভালবাসতো আর তার হৃদয়টাও ছিল বড় কোমল। সে তার স্ত্রীর চোখে জল সইতে পারলো না। সুতরাং পরদিন আবার তাকে দেখা গেল বাজারের ভিতর টেবিলের ধারে বসে থাকতে। পূর্বের মতই সে চীৎকার করে বলতে লাগলো, আমি একজন দৈবজ্ঞ। আমি গ্রহ-নক্ষত্রের হের-ফের সব কিছুই জানি। আপনাদের ভবিষ্যৎ বলতে পারি।

আবার একটা ভিড় সৃষ্টি হলো। কেউ কেউ তাকে উপহাস করতে লাগলো, কিন্তু অনেকেই তার ক্ষমতায় বিশ্বাস করেছিল। কারণ, হারানো মণির গল্পটা এর মধ্যেই অনেকে শুনেছিল।

আকাশের সূর্য উপরে উঠতে লাগলো। আর আহ্‌মদও খুব শ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। এই সময় একজন ভদ্রমহিলা একটা মোটা কাপড়ে নিজের মুখ ঢেকে আসছিলেন। তিনি মাথা নত করে গভীর চিন্তামগ্ন অবস্থায় পথ চলছিলেন। কারণ, তিনি এক বহুমূল্য কণ্ঠহার হারিয়ে ফেলেছিলেন। ভয়ে তিনি তাঁর স্বামীকে একথা বলতে পারছিলেন না।

যখন তিনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন যেন শুনতে পেলেন কে বলছে, দেখ, এখানে নতুন জ্যোতিষী এসেছেন। তিনি রাজার মুকুট থেকে অপহৃত মণিটা কোথায় আছে, জহুরীকে তা বলে দিলেন। তিনি সব বলতে পারেন, এমন কি, কে কি চিন্তা করে, তাও।

ভদ্রমহিলা ভাবলেন যে, বোধ হয় তিনি আমার কণ্ঠহারও বের করে দিতে পারেন। তিনি আহ্‌মদের কাছে গিয়ে বললেন, গণক মশাই, লোকে বলে, আপনি নাকি সব জিনিসই জানেন। যদি তাই হয়, তাহলে

আমি যে কণ্ঠহার হারিয়ে ফেলেছি, তা কোথায় আছে, তা যদি বলেন। যদি আপনার কথামত আমি সেই হার খুঁজে পাই, তাহলে আপনাকে পঞ্চাশ মোহর দেব।

বেচারা আহ্‌মদ! আবার সে বিপদে পড়লো। কেননা, সে কি করে বলবে মহিলার কণ্ঠহার কোথায় আছে। যাহোক্, সে অগত্যা মাটির দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলো, কি করা যায়। ভাবতে ভাবতে তার দৃষ্টি পড়লো মহিলার উপর। সে মহিলার মুখ-ঢাকা কাপড়ে একটা বড় ছিদ্র দেখলো। সে অন্য চিন্তা ভুলে হঠাৎ বলে উঠলো, আপনি গর্তটা দেখেছেন?

মহিলার মন তাঁর ক্ষতির কথাতেই ছিল পূর্ণ। তিনি অন্য আর কিছু না ভেবে বললেন, আহ্‌মদ তার হারানো কণ্ঠহারের কথাই বলছে। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে তিনি বললেন, আমি শীঘ্রই ফিরে আসছি। এই বলে তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর বাড়ী চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার আহ্‌মদের কাছে ফিরে এলেন। তখন তাঁর হাতে মোহরের এক থলে। তিনি বললেন, বিজ্ঞ জ্যোতিষী, এই যে মোহর। আপনি সত্যসত্যই এগুলো পাবার যোগ্য। আপনি যখন আমাকে গর্তে তাকিয়ে দেখতে বললেন, আমার তখনই মনে পড়লো যে, আমি স্নান করবার সময় স্নানাগারের দেয়ালেয় গর্তে হারটা রেখেছিলাম। যাহোক, আমার মনে হয়, আপনি অন্যান্য গণকদের চেয়ে অনেক বেশী জ্ঞানী।

আহ্‌মদ সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরলো। ভাবলো, এবারও সে কোনক্রমে রক্ষা পেলো; কিন্তু ভবিষ্যতে আর ভাগ্য-পরীক্ষা করবে না, কেননা তৃতীয় বারে আর রক্ষা পাবে না।

কিন্তু তার স্ত্রীকে পঞ্চাশটি মোহর দিলেও সে তাকে বিশ্রাম নিতে দিল না। সে আরো অনেক স্বর্ণমুদ্রা চায়, কেননা, সে চায় নগরের ধনী মহিলাদের মত বাড়ী তৈরী করতে। সে আবার বললো, আবার যাও, তোমার ভাগ্য যখন সুপ্রসন্ন, তখন তুমি ভালো কিছু পাবেই।

এদিকে ঠিক এই সময়ে রাজপ্রসাদে এক বিরাট ডাকাতি হয়েছিল।

চল্লিশ বাক্স সোনা আর মণিমুক্তা চুরি গিয়েছিল। কিন্তু কে বা কারা চুরি করলো, তা কেউ ধরতে পারলো না।

রাজজ্যোতিষীকে ডেকে রাজা বললেন, আপনাকে সাত দিন সময় দিলুম, একবার নয় আপনি সাতবার গণনা করে চল্লিশ বাক্স জিনিস কোথায় আছে তা সপ্তাহের মধ্যে বলবেন। অপারগ হলে ঘাতকের হাতে প্রাণ হারাতে হবে। রাজজ্যোতিষী যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন, কিন্তু সাতদিন চলে গেল তবু তার কোন হদিস্ মিললো না। সুতরাং রাজজ্যোতিষীর মাথা কাটা গেল।

তারপর রাজার একজন সভাসদ্ রাজাকে নতুন জ্যোতিষী আহ্মদকে ডেকে আনবার জন্য লোক পাঠালেন।

আহ্মদ সব শুনে তার স্ত্রীকে বলল, এখন বোঝ, তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে ফেললে। আমি যেন ক্রমশই মরণের মুখে এগিয়ে যাচ্ছি।

যাহোক্, আহ্মদ রাজার কাছে তো কাঁপতে কাঁপতে গেল। রাজার সামনে মাথা নত করে তাঁর আদেশের অপেক্ষায় থাকল।

রাজা তার দিকে তাকিয়ে বললেন, আহ্মদ, আমাকে বলতে হবে যে, কে আমার জিনিস চুরি করেছে।

আহ্মদ কিছুক্ষণ চিন্তা করে উত্তর দিল, মহারাজ, চোর একটা নয়,—অনেকগুলো। চল্লিশজন চোর প্রত্যেকে এক এক বাক্স মণিমুক্তা অপহরণ করেছে।

তাই নাকি—রাজা বললেন, বেশ তাহলে এখন তাদের নাম বল।

আহ্মদ উত্তর করল, আমি এখন তা বলতে পারবো না। চাঁদ-তারার সঙ্গে আলোচনা করতে আমার সময় লাগবে। আমাকে চল্লিশ দিন সময় দিন। সেই সময়ের শেষে আমি আপনাকে সব বলতে পারব।

রাজা বললেন, আচ্ছা বেশ! আমি তোমাকে চল্লিশ দিন সময় দিলাম। কিন্তু ঐ সময়ের শেষে আমি যা জানতে চাই তা বলতে না পারলে আমার পূর্বের জ্যোতিষীর মত তোমাকেও তোমার মাথা হারাতে হবে।

আহ্‌মদ বাড়ী ফিরে গেল। তার মাথা যেন কেমন গোলমাল হয়ে গিয়েছে।

সে তার স্ত্রীকে বলল, দেখ, তুমিই কিন্তু আমার জীবন নষ্ট করে দিলে। আমি এবার নিশ্চয়ই ধরা পড়ব। আমার জীবন আর মাত্র চল্লিশ দিন। হ্যাঁ, তুমি চল্লিশটি খেজুর একটা পাত্রে রেখে দাও। আমি প্রত্যেক দিন একটা একটা করে খাব। আর আমি তাতে বুঝব যে, আর কতদিন আমি পৃথিবীতে আছি।

তার স্ত্রী স্বামীর কথামত চল্লিশটি খেজুর একটা পাত্রে রেখে তারপর অপহৃত বাক্স এবং চোর খুঁজে বার করা সম্ভব কিনা এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগল।

ইতিমধ্যে সেই চল্লিশজন দস্যু খুবই ভয় পেয়ে গেল। কেননা, তারা নতুন গণক আহ্‌মদকে রাজার কাছে তাদের প্রকৃত সংখ্যা বলতে শুনেছে। সুতরাং কারা যে চোর তাও সে নিশ্চয়ই জানে।

দলপতি দস্যুদের বলল, আমাদের একজন আজ সন্ধ্যার পর সেই গণকের বাড়ী গিয়ে আড়ি পাতবে। সে তার স্ত্রীকে কি বলে তা সে শুনে এসে আমাদের বলবে, তাহলে আমরা ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করব।

সন্ধ্যার পর একজন ডাকাত আহ্‌মদের বাড়ীর কাছে গিয়ে ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে রইল। তাদের সব কথাই সে শুনতে পেল। ডাকাতটা যখন দাঁড়িয়ে ছিল তখন আহ্‌মদ একটা খেজুর খেয়ে বলে উঠল, আঃ! এটা হচ্ছে চল্লিশটার প্রথম।

একথা শুনেই চোর ভয়ে দৌড়ে গিয়ে দলপতিকে সব কথা বলল, এক অদ্ভুত ব্যাপার সর্দার। সে, আমাকে দেখতে না পেয়েও আমার উপস্থিতি বুঝতে পারল।

পরদিন রাত্রে ডাকাত-সর্দার তার দলের দুজন লোককে পাঠাল। খেজুর খেতে খেতে, আহ্‌মদকে তারা বলতে শুনল 'আজ দুটো হলো।'

প্রত্যেক রাত্রে দলপতি এক একজন করে বেশী লোক পাঠাতে লাগল। তারাও প্রত্যেক দিন আহ্‌মদকে তাদের উপস্থিতি উল্লেখ করতে শুনল।

শেষ রাত্রে ডাকাতরা সবাই আহ্‌মদের বাড়িতে এল। আহ্‌মদ তখন শেষ খেজুরটি গ্রহণ করে বলে উঠল, হঠাৎ সংখ্যা পূর্ণ হল। আজ রাত্রে চল্লিশ হল।

চোরেরা এবার নিশ্চিতই বুঝল যে আহ্‌মদ তাদের সব কথা জানে। তারা বুঝল যে পালাতে গেলে কোন ফলই হবে না, স্থতরাং আহ্‌মদকে বুঝিয়ে বন্ধ করাই উচিত। এই ভেবে রাত্রি প্রভাত হবার একঘণ্টা আগে তারা আহ্‌মদের বাড়ি গিয়ে দরজায় আঘাত করল।

বেচারা আহ্‌মদ ভাবল যে রাজার সৈন্য এলো তাকে কারাগারে নিয়ে যেতে। সে বিছানা ছেড়ে উঠে চীৎকার করে বলল, তোমরা যে কি চাও জানি। তোমাদের এ ভারী অন্যায়!

দস্যুদলপতি উত্তর দিল, আপনি একজন জ্ঞানী ব্যক্তি, আপনি তো সবই জানবেন। আপনার ক্ষতি করতে আমরা আসিনি। আপনি যদি রাজাকে এসব কথা না বলেন, তাহলে আপনাকে আমরা দু'হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিব।

আহ্‌মদ বলল, এসব কথা বলো না। আমি সব কথা জানিয়ে দেব সবাইকে।

দস্যুরা খুবই ভয় পেয়ে গেল। তারা অনুনয় করে বলল, আমাদের উপর দয়া করুন। আমরা রাজার সম্পদ্ ফিরিয়ে দেব।

মুচি আহ্‌মদ বুঝতে পারল না, সে জেগে আছে না স্বপ্ন দেখছে! সে বুঝল, এরা রাজার সৈন্য নয়, এরা ডাকাতের দল। মুহূর্তের মধ্যেই সে মনে মনে সব ঠিক করে ফেলল। সে কঠোর কণ্ঠে বলল, তোমরা দোষী, আমার কাছে তোমরা রক্ষা পেতে না। কিন্তু এখন তোমাদের বাঁচাব। এখনি অপহৃত বাক্সগুলো নিয়ে দক্ষিণদিকে যে ধ্বংসাবশেষ আছে সেখানে পুঁতে ফেল। এ কাজ তোমরা করলে, তোমাদের জীবন-রক্ষা পাবে।

চোরেরা যত তাড়াতাড়ি পারল আহ্‌মদের কথামত কাজ করল। আহ্‌মদ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আরো কিছুক্ষণ ঘুমাল।

কিছুক্ষণ পরে রাজার একদল সৈন্য এসে আহ্মদকে রাজার কাছে যেতে বলল।

আহ্মদ যথাসাধ্য ভাল পোষাক পরে রাজসভায় গেল।

রাজা বললেন, আহ্মদ, কিছু খোঁজ পেলে ?

মুচি উত্তরে বলল, হুঁজুর কি চোরদের চান, না কেবল ধনসম্পত্তিই চান।

আমি নক্ষত্রদের জিজ্ঞাসা করে জানলাম, তারা একটা মাত্র জিনিষই দেবে।

রাজা কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, আমি ডাকাতদের শাস্তি দিতেই চেয়েছিলাম, কিন্তু যখন একটা জিনিষই হবে, তখন আমার ধন-সম্পদই আমি চাই।

আহ্মদ বলল, তাহলে আমাকে অনুসরণ করলে আমি দেখিয়ে দেব কোথায় তা আছে।

রাজা এবং তাঁর সভাসদরা আহ্মদের সঙ্গে দক্ষিণদিকে যে ধ্বংসস্তূপ আছে, সেখানে গেলেন। তারপর এক জায়গায় আহ্মদ দাঁড়িয়ে পড়ল। সে জ্যোতিষীদের মত কতকগুলো আশ্চর্য কথা উচ্চারণ করে রাজার লোকদের সে জায়গাটা খুঁড়তে বলল।

লোকজনরা সে জায়গা খুঁড়ে ক্রমে ক্রমে চল্লিশটা বাক্সই দেখতে পেল। বাক্সগুলোর একটাও তখনও ভাঙা হয়নি। রাজার শিলমোহর পর্যন্ত অবিকৃত আছে।

রাজার আনন্দের সীমা রইল না। তিনি আহ্মদকে তাঁর রাজসভায় এক উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করলেন। কিন্তু মুচির স্ত্রীকে রাজপ্রাসাদের মধ্যে ঢুকতে দেওয়া হল না। কেননা, একজন স্বার্থপর স্ত্রী তার স্বামীর সম্পদ ভোগ করার উপযুক্ত নয়।

শিশুর অভিযান

(কানাডার উপকথা)

বহুদিন আগে ল্যাজিমোদিয়ার নামে এক ফরাসী কানাডিয়ান্ পরিবার উত্তর আমেরিকায় আসেন। মাদাম ল্যাজিমোদিয়ারই হচ্ছেন সর্বপ্রথম ইউরোপীয়ান্, যিনি কানাডার তৃণাচ্ছাদিত বিস্তীর্ণ প্রান্তরে (প্রেইরি অঞ্চলে) বাস করতেন।

একদিন সকালে তিনি তাঁর ছোট্ট মেয়ে রেনিকে বললেন, আমি জল আনতে নদীতে যাচ্ছি। তুমি তোমার ছোট্ট ভাইয়ের দিকে লক্ষ্য রেখো।

ছোট্ট রেনির বয়স তিন বছরের বেশী নয়। কিন্তু সে মায়ের কথা বেশ বুঝতে পারত। তাই মা নদীতে জল আনতে গেলে ছোট্ট ভাইয়ের কাছে গিয়ে আধ আধ স্বরে গান করতে লাগল এবং দোল্‌নাটা আস্তে আস্তে দোলাতে লাগল। রেনি বলতে লাগল, ঘুমাও ভাই ঘুমাও। অবশেষে ছোট্ট শিশু তার নীল চোখ দুটি বন্ধ করল।

রেনি তখন ভাবল, এবার আমি নদীতে গিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসি। কিন্তু সে দরজার দিকে যাবার আগেই ঘরের ভিতর একজন রেড্ ইণ্ডিয়ান্ মেয়ে ঢুকল।

মেয়েটি রেনিকে লক্ষ্য করল না। যেখানে শিশুটি শুয়ে ছিল, সে সেই দোল্‌নার কাছে গেল। ছোট্ট রেনি কিছু বুঝবার আগেই রেড্ ইণ্ডিয়ান্ মেয়েটি বিছানা থেকে শিশুটিকে উঠিয়ে নিল এবং একটা কম্বলে জড়িয়ে তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরে চলে গেল।

মেয়েটা ছোট্ট ভাইকে নিয়ে চলে যাচ্ছে দেখে, রেনি ঘর থেকে দৌড়ে গিয়ে চেঁচাতে লাগল—মা, মা, একজন ছেলেধরা এসে ভাইকে নিয়ে চলে গেল।

নদী ছিল কাছেই। সুতরাং মাদাম ল্যাজিমোদিয়ার মেয়ের চীৎকার শোনামাত্রই হাতের পাত্র ফেলে দিয়ে নদী থেকে এসে রাস্তায় দাঁড়ালেন।

রেনি চেঁচিয়ে বলল, মা, তুমি তাড়াতাড়ি এস। সে রেড্ ইণ্ডিয়ান মেয়েটির পায়ের দাগ তার মাকে দেখিয়ে দিয়ে বলল, একজন ছেলেধরা এসে ভাইকে নিয়ে গেল।

মুহূর্তের মধ্যে ব্যাপারটা বুঝে সঙ্গে সঙ্গেই মাদাম ল্যাজিমোদিয়ার রেড্ ইণ্ডিয়ান মেয়েটার পেছনে দৌড়াতে লাগলেন। আর তিনি বলতে লাগলেন, আমার ছেলে ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও। কিন্তু সেই মেয়েটি আরো জোরে দৌড়োতে লাগল।

প্রায় এক মাইল দৌড়োবার পর রেড্ ইণ্ডিয়ান মেয়েটি ক্লান্ত হয়ে পড়ল। অবশ্য মাদাম ল্যাজিমোদিয়ারও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু মেয়েটিকে ধীরে ধীরে হাঁটতে দেখে মাদাম জোরে দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরে ফেললেন। তিনি বললেন, আমার ছেলে আমাকে দিয়ে দাও।

মেয়েটি তাঁর দিকে ফিরে তাকিয়ে শিশুটিকে আরো জোরে হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরল। মাদাম ল্যাজিমোদিয়ার তার হাতের কম্বলটি ধরে চীৎকার করে উঠলেন, আমার শিশু, তুমি আমার ছোট্ট জীনকে চুরি করেছ।

মেয়েটি তখন কম্বল থেকে তাঁর হাত সরিয়ে দিয়ে চলে যাবার জন্য উদ্যত হল। কিন্তু শিশুর মায়ের চোখে অশ্রুর ধারা দেখে খুবই দুঃখ বোধ করল এবং শিশুটিকে ফেরৎ দিল। ছোট্ট ছেলেটিও মায়ের কোলে ফিরে খুবই হাসতে লাগল। তারপর রেড্ ইণ্ডিয়ান মেয়েটি কিছুক্ষণ তাঁদের লক্ষ্য করে চলে গেল।

মাদাম ল্যাজিমোদিয়ার অথবা রেড্ ইণ্ডিয়ান মেয়েটি কেউ পরস্পরের ভাষা জানত না। সুতরাং স্বামী বাড়ী ফিরলে মাদাম ল্যাজিমোদিয়ার তাঁকে সব কথা বলে শিশুটিকে নিয়ে যাবার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁর স্বামী বললেন, রেড্ ইণ্ডিয়ান মেয়েটি শিশুটিকে দেবদূত ভেবেছিল। তার এমন নীল চোখ এবং সোনালী রংয়ের চুল দেখে মেয়েটি নিশ্চিত ধরে নিয়েছিল, এই শিশুটিকে তাদের নিজের লোকেদের কাছে নিয়ে গেলে তাদের শিকার ও মাছধরার নব সৌভাগ্যের সূচনা হবে।

ধর্মবুদ্ধি-পাপবুদ্ধি কথা

(নরওয়ের উপকথা)

ধর্মবুদ্ধি আর পাপবুদ্ধি নামে দুই ভাই কোনও এক দেশে বাস করত। ধর্মবুদ্ধি সবসময়ই সত্যকথা বলত, সকলেই তাকে ভালবাসত। কিন্তু পাপবুদ্ধি ছিল ঠিক এর উল্টো। সে সব সময়েই মিথ্যাকথা বলত, কেউই তাকে বিশ্বাস করতো না। তাদের বাবা বহুদিন হল পরলোকে। তাই তারা যখন বড় হল, তখন তাদের গরীব মা তাদের অর্থ উপার্জনের জন্য বিদেশযাত্রা করতে বলল।

দুভাই তখন দুই থলে খাবার নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। সন্ধ্যের সময় তারা এক গভীর বনের কাছে এল। এক গাছের নীচে বসে তারা নিজ নিজ খাবার থলি বের করল। সারাদিন চলার পর তাদের তখন বেশ খিদে পেয়েছে।

পাপবুদ্ধি বলল—প্রথমে তোমার খাবারই দুজনে খাই। তারপর ওটা শেষ হলে আমার খাবারে হাত দেওয়া যাবে।

ধর্মবুদ্ধি পাপবুদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদন করে নিজের থলে থেকে খাবার বের করল। পাপবুদ্ধি ভাল ভাল খাবারগুলো তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলল। ধর্মবুদ্ধির ভাগ্যে পড়ল নিকৃষ্ট খাবার।

পরের দিন সকালে তারা ধর্মবুদ্ধির থলের খাবার থেকেই প্রাতর্ভোজন এবং দুপুরের সব খাবার খেল। এখন তার থলেতে আর এক কণা খাবারও অবশিষ্ট রইল না। রাত্রে যখন খাবার সময় হল, তখন ধর্মবুদ্ধি তার ভাইয়ের কাছ থেকে খাবার চাইল। কিন্তু পাপবুদ্ধি তাকে খাবারের ভাগ দিতে অস্বীকার করে বলল, এ খাবার ত তার নিজস্ব। সুতরাং, এগুলোর অধিকারী একমাত্র সে-ই।

কিন্তু আমার থলের শেষ খাবারটুকু পর্যন্ত তো তুমি খেয়েছ—ধর্মবুদ্ধি বলল।

পাপবুদ্ধি বলল—এ সব রকম কথা বলতে বেশ ভালই লাগে। তুমি এমনি বোকা যে তোমার খাবার খেল অন্য একজন তোমারই সামনে। তোমার এই বোকামির জন্যই তুমি এখানে বসে থেকে অনাহারে মর।

ধর্মবুদ্ধি বলল—বেশ, তুমি নামে পাপবুদ্ধি, কাজেও তাই। চিরদিন তাই আছ, সারাজীবন ওরকমই থাকবে।

একথা শুনে পাপবুদ্ধি খুব রেগে গেল। সে ধর্মবুদ্ধির উপর লাফিয়ে পড়ে তার চোখ দুটি অন্ধ করে দিল। তারপর সে তাড়াতাড়ি সেই বন ছেড়ে কোথায় যেন চলে গেল।

বেচারা ধর্মবুদ্ধি একাকী ঘুরতে ঘুরতে এক গভীর বনে পথ হারিয়ে ফেলল। সে চোখে দেখতে পাচ্ছিল না, স্নুতরাং কোন্ পথে যেতে হবে তা বুঝতে পারল না। অবশেষে একটা বড় লেবুগাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ভাবল, আজ রাতের মত এই গাছেই থাকা যাক। সকালবেলা তখন পথ খুঁজে নিলে হবে। এই ভেবে সেই লেবুগাছের উপর চড়ে বসে রইল।

কিছুক্ষণ পরে ধর্মবুদ্ধি গাছের নীচে বিভিন্ন শব্দ শুনতে পেল। নানা পশু এসে যখন পরস্পরকে সম্ভাষণ করতে লাগল, তখন ধর্মবুদ্ধি বুঝল যে তারা হচ্ছে ভালুক, নেকড়ে, শেয়াল আর খরগোশ। তারা গাছের নীচে খাওয়া-দাওয়া করল। আহারাদি শেষ হলে তারা পরস্পর আলাপ-আলোচনা করতে লাগল। অবশেষে শেয়াল বলল—এস, আমরা সবাই একটা করে গল্প বলি।

শেয়ালের এই প্রস্তাবে কারো আপত্তি করার কিছু ছিল না। স্নুতরাং ভালুক গল্প বলতে উঠল। কেননা, ভালুকই ছিল সেই দলের সর্দার। ভালুক বলল, এই দেশের রাজার দৃষ্টিশক্তি এতই কম যে দুহাত দূরের জিনিষও দেখতে পান না। এই লেবুগাছের পাতার ভোরের শিশির চোখে দিলে দৃষ্টিশক্তি আবার ফিরে পাবেন।

নেকড়ে বলল, সত্যি কথাই বলেছ। শোন, রাজার এক কালা-বোবা

মেয়ে আছে। আমি যা জানি তা যদি রাজা জানতেন, তাহলে তিনি তাঁর মেয়েকে ভাল করতে পারতেন। গত বছর রাজকুমারীর মুখ থেকে খাওয়ার সময় এক টুকরা রুটি খসে পড়ে। একটা ব্যাঙ্ এসে সেই রুটি খেয়ে ফেলে। কিন্তু টুকরাটি তার গলায় এখনও আট্‌কে আছে। যদি সেই ব্যাঙ্‌টার গলা কেটে রুটির টুকরাটি বের করে রাজকুমারীকে দেওয়া যায়, তাহলেই সে আবার কথা বলতে পারবে আর কানেও শুনতে পাবে।

নেকড়ের পর শেয়াল বলল, যা আমি জানি তা যদি রাজা জানতেন, তাহলে তাঁর প্রাসাদে আর কোন জলকষ্ট হ'ত না। কেননা, রাজপ্রাসাদের বাগানে যে বিরাট পাথর পড়ে আছে তার তলা খুঁজলেই মিলবে সুস্বাদু জলের একটা ঝরণা।

নিচু গলায় এবার খরগোশ বলতে শুরু করল, দেশের মধ্যে রাজারই সবচেয়ে ভাল ফলের বাগান আছে। কিন্তু দু একটা আপেল ফল ছাড়া অন্য কোন ফল সেই বাগানে ফলে না। কেননা, সেই বাগানের চারধারে একটা মোটা সোনার শিকল তিন বেড় দিয়ে পোতা আছে। যদি কেউ মাটি খুঁড়ে সেটা বের করতে পারে, তাহলে সেই বাগানে আপেল, ন্যাসপাতি প্রভৃতি অন্য অন্য ফল প্রচুর ফলবে।

শেয়াল বলল, তোমরা যা বললে তা সবই সত্য। কিন্তু এখন খুব তো দেরী হয়ে গেল। এখন বাড়ী ফিরে চল।

পশুর দল যাবার পর ধর্মবুদ্ধি গাছের উপরেই ঘুমিয়ে পড়লো এবং সকালে পাখীর ডাকে জেগে উঠলো। গাছের পাতা থেকে শিশিরবিন্দু নিয়ে সে চোখে দিল। আশ্চর্যের কথা, সঙ্গে সঙ্গেই সে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল।

তারপর ধর্মবুদ্ধি ঐ দেশের রাজার কাছে গিয়ে তাঁর অধীনে চাকুরী করতে লাগলো।

একদিন রাজা রাজপ্রাসাদের বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এমন সময় তিনি পিপাসার্ত হয়ে জল চাইলেন। রাজার পরিচারক তাঁকে জল দিল, কিন্তু সেই জল ছিল খুবই খারাপ। তাছাড়া, রাজপ্রাসাদে ওর চেয়ে আর

ভাল জল পাবার সম্ভাবনা ছিল না। রাজা জলস্পর্শ না করে বললেন, আমার রাজ্যে এমন কোন লোক নেই যে আমার মত এরকম জল খায়। অথচ এই জলটাও পাহাড়ের উপর থেকে নলে করে বহুকষ্টে আনতে হয়।

ধর্মবুদ্ধি তখন রাজাকে বলল, দুঃখের কথা বটে। কিন্তু আপনি আমাকে মাটি খুঁড়তে কতকগুলো লোক দিন। ঐ যে বড় পাথরটা আছে ওরই নীচে সুস্বাদু জলের এক ঝরণা আছে বলে আমার মনে হয়।

ধর্মবুদ্ধির সঙ্গে রাজা তখনি কয়েকজন লোক দিলেন। তারা পাথরটা উঠিয়ে ফেলে তার নীচে খুঁড়তেই পরিষ্কার জল বেগে বাইরে ছুটে এল। এই জল এমনই সুস্বাদু আর পরিষ্কার যে, সে দেশে তেমন জল আর কোথাও ছিল না।

আরেকদিন রাজা যখন আবার বাগানে এলেন, তখন দেখলেন যে একটা বাজপাখী তাঁর পায়রাগুলোর পেছনে ছুট্‌ছে। রাজার লোকজন হাততালি দিয়ে চীৎকার করে উঠলো। রাজা তাঁর বন্দুক এনে বাজপাখীর দিকে লক্ষ্য স্থির করলেন কিন্তু দৃষ্টিশক্তি অল্প থাকার জন্য কিছুই নজরে পড়ল না।

দুঃখে অতিশয় অভিভূত হয়ে রাজা বললেন, আঃ! কেউ যদি আমার চোখ ভাল করে দিতে পারতো! মনে হচ্ছে, আমি অন্ধ হয়ে যাব।

ধর্মবুদ্ধি রাজার দুঃখের কথা শুনে এগিয়ে এসে বলল, আমি আপনার চোখ ভাল করে দিতে পারি। এই বলে সে নিজের চোখ কি করে ভাল হল সেই সব গল্প বলল। রাজা সব শুনে সেই দিনই বনে গিয়ে লেবুগাছে রাত কাটালেন। তারপর সকালে গাছের পাতার উপরে জমা শিশির চোখে লাগাতেই তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন।

এ ব্যাপারের পর থেকেই রাজা ধর্মবুদ্ধিকে খুব ভালবাসতেন। কি দেশে, কি বিদেশে সবসময়ই সে রাজার সঙ্গে সঙ্গে থাকত।

সেদিন তারা ফলের বাগানে বেড়াচ্ছে, এমন সময় রাজা বললেন, এই দেশে কোন লোকেরই আমার মত ফলের বাগান নেই, অথচ মাত্র দুএকটা আপেল ছাড়া আর কোন ফলই পাওয়া যায় না।

ধর্মবুদ্ধি বলল, বেশ ! বেশ ! তাহলে আমি যা বলি, তাই করার ব্যবস্থা করুন। এই বাগানের চারধারে একটা জিনিষ পোতা আছে। ওটা তুলে ফেলার ব্যবস্থা করুন, তাহলেই বাগানে বেশ ফল ফলবে।

রাজা ধর্মবুদ্ধির কথামত লোকজন লাগালেন। তারা বাগানের চারধার থেকে মাটি খুঁড়ে একটা বিরাট সোনার শিকল উপরে তুললো।

ধর্মবুদ্ধি এখন বেশ বড়লোক, এমন কি অনেক বিষয়ে রাজার চেয়েও সে বেশী প্রতিপত্তিশালী। রাজাও খুব খুশী। কেননা, তাঁর ফলের বাগানে এখন আপেল, ন্যাসপাতি প্রভৃতি ফল পর্যাপ্ত পরিমাণে ফলে। আর দেশের লোকও সেরকম সুস্বাদু ফল কোনদিন খায়নি।

সেদিন রাজা আর ধর্মবুদ্ধি বেড়াতে বেরিয়েছেন। এমন সময় রাজকুমারী সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাজা তাঁকে দেখে বললেন, দুঃখের কথা, আমার মেয়ে এমন সুন্দরী অথচ কথা বলতে পারে না, আর শুনতেও পায় না কিছু।

কিন্তু তাকে ভাল করার উপায়ও তো আছে—ধর্মবুদ্ধি বলে। একথা শুনে রাজা খুব খুশী হলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন, যদি সে রাজকুমারীকে সুস্থ করে দিতে পারে, তবে রাজকুমারী আর অর্ধেক রাজত্ব তাকে তিনি দান করবেন।

ধর্মবুদ্ধি তখন কয়েকজন লোক নিয়ে সেই ব্যাঙ্‌টাকে খুঁজে বের করল। তারপর সে ব্যাঙ্‌টার গলা কেটে সেই রুটির টুক্‌রাটি বের করে রাজকুমারীকে দিল। এক ঘণ্টার মধ্যেই রাজকুমারী সাধারণ লোকের মত কথা বলতে এবং শুনতে সক্ষম হলেন।

তারপর একদিন মহাধূমধামে ধর্মবুদ্ধির সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে হয়ে গেল। সেদিন যে বিরাট ভোজের আয়োজন হল, সেরকম ভোজের কথা দেশের লোকরা কোনদিন শোনেনি।

ধর্মবুদ্ধি যখন নাচের ঘরে, তখন একজন ভিখারী এসে কিছু খাবার চাইল। তাকে দেখে খুব গরীব আর ক্লান্ত বলে মনে হচ্ছিল, কিন্তু ধর্মবুদ্ধি তার ভাই পাপবুদ্ধিকে চিনতে পারল।

কি হে চিনতে পার ?—ধর্মবুদ্ধি জিজ্ঞাসা করে।

পাপবুদ্ধি বলল, আপনার মত মহৎ লোক আর কোথায় দেখব বলুন ?

ধর্মবুদ্ধি তখন বললো, তুমি কিন্তু এর আগেও আমাকে দেখেছ। গত বছরের ঠিক এই দিনেই তুমি আমার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে দিয়েছিলে। তুমি কাজে আর নামে পাপবুদ্ধি। একথা আমি আগে বলেছি আর এখনও বলছি। কিন্তু তুমি আমার ভাই। সুতরাং, তুমি এখন এখানে খাও-দাও ; তারপর গত বছর আমি যে লেবুগাছে ছিলাম, সেখানে যাও। তুমি যদি সেই গাছে থেকে ভাল কিছু শোনো, তাহলে তোমার ভাগ্যের পরিবর্তন হতে পারে।

পাপবুদ্ধিকে আর দুবার একথা বলতে হল না। সে ভাবল, ধর্মবুদ্ধি যদি সেই গাছের উপর রাত্রিযাপন করে এক বৎসরের মধ্যে অর্ধেক রাজ্যের রাজা হয়, তাহলে আমিই বা হব না কেন ?

এই ভেবে সে তাড়াতাড়ি সেই বনের লেবুগাছে উঠে বসে রইল।

বনের পশুরা যথারীতি সেই গাছের তলায় এসে পানভোজন করল। শেয়াল তখন সকলকে একটা করে গল্প বলতে বলল। পাপবুদ্ধি তাদের কথা শোনবার জন্য কান খাড়া করে রইল, কিন্তু ভালুক জলদগম্ভীর কণ্ঠে বলল—গত বছর আমরা যা বলেছিলাম তা একজন লোক শুনে ফেলেছিল। সুতরাং, আমরা অনেক কিছু জানলেও আর কোনদিন তা প্রকাশ করবো না।

ভালুকের একথার পরে উপস্থিত পশুরা পরস্পরের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

পাপবুদ্ধি পূর্বের মতই ভিক্ষা করে বেড়াতে লাগল। কেন না সে নামে পাপবুদ্ধি আর কাজেও পাপবুদ্ধি।

———

বিপ্পোর বাহাদুরী

(ইতালীয় উপকথা)

বহুদিন পূর্বে ইতালীতে বিপ্পো নামে একটি ছোট ছেলে ছিল। সে ছিল খুব ভাল ছেলে। তার বড় বড় কালো চোখ এবং সুন্দর দেহ আর বেশ সাদা দাঁত ছিল। সব সময়ই সে হাসিমুখে থাকত, সে স্ফূর্তি খুব ভালবাসতো।

একদিন তার মা তাকে ঘরের মেঝে পরিষ্কার করতে বললেন। ঘরের মেঝেতে সে একটি পেনি কুড়িয়ে পেল। তারপর সে জিজ্ঞাসা করল, মা, আমি কি পেনিটি নেব?

মা বললেন, হ্যাঁ, ওটা তোমারই, কেননা তুমি খুব ভাল ছেলে। আর কাজকর্মে আমাকে সাহায্য কর।

বিপ্পো তো মহা আনন্দে নাচতে লাগল। তারা খুব গরীব, কাজেই সচরাচর এক পেনিও তার ভাগ্যে বড় একটা জোটে না। সে ভাবল, এখন এ দিয়ে আমি কি কিনব?

সে বাজারে দৌড়ে গিয়ে দোকানগুলোয় উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল এবং কি যে কিনবে তা ঠিক করতে তার অনেক সময় লাগল। অবশেষে সে একটা দোকানে গিয়ে এক পেনি দিয়ে সুন্দর সুন্দর পাকা ডুমুর কিনল।

এখন আমার একটা ভোজ হবে। এই বলে সে এক বনে গিয়ে এক গাছের উপর বসল এবং সেই ডুমুর খেতে লাগল।—আ! ডুমুরগুলো কি সুন্দরই না খেতে!

এদিকে একজন বুড়ো লোক বনের ভেতর দিয়ে আসছিল। সে হচ্ছে ছদ্মবেশী এক ভূত। বিপ্পোকে সে গাছের উপর ডুমুর খেতে দেখল এবং বিপ্পোর নধর চেহারা দেখে তার লোভ হল। সে এগিয়ে এসে বলল, ওহে! তুমি কি আমাকে একটা ডুমুর দেবে?

বিপ্পো ছেলেটি লোভী ছিল না, আর এই লোকটাকেও খুব গরীব আর

বুড়ো বলে তার মনে হল। সুতরাং সে একটা ডুমুর ছুঁড়ে ফেলল। কিন্তু সেই ডুমুরটা কাদার উপরে পড়ে গেল। ভূতটা তাই আবার বলল, ওহে বিপ্লো, আর একটা ডুমুর দাও না।

বিপ্লো আবার একটা ডুমুর ছুঁড়ে ফেলল। কিন্তু এবারও তা কাদায় পড়ল। বিপ্লো বলল, তুমি ধরছ না কেন?

তুমিত ঠিক সোজাভবে ফেলছ না, ভূতটা উত্তর দিল। মাথা নীচু করে আমার হাতে ডুমুর দাও, তাহলে আর নষ্ট হবে না।

বিপ্লো গাছ থেকে একটু নীচে নেমে, যেই একটা ডুমুর ভূতের হাতে দিতে গেল, অমনি সেই দুষ্ট ভূতটা তাকে ধরে টানতে লাগল।

বিপ্লো আর্তনাদ ও ধ্বস্তাধস্তি করল, কিন্তু লোকটা তাকে এক বস্তার মধ্যে পূরে বস্তার মুখ বন্ধ করে দিল। তারপর বস্তাটাকে পিঠে ফেলে সে তার পাহাড়ের বাড়ীর দিকে চলল।

এদিকে বিপ্লো ছিল বেশ মোটা আর বয়সের তুলনায় বেশ মোটা-সোটা। সুতরাং, ওকে নিয়ে যেতে ভূতটার খুব কষ্ট হতে লাগল। তাছাড়া, তার বাড়ীও ছিল খুব দূরে। তাই সে হাঁপিয়ে পড়ল এবং রেগে গর্জন করতে লাগল। অবশেষে সে এতই ক্লান্ত হয়ে পড়ল যে আর এক পাও যেতে পারল না।

সে একটা গাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্য বসল। সেখানে তার বেশীক্ষণ থাকার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সূর্য ছিল খুব প্রখর এবং সেও ছিল খুব ক্লান্ত। সেখানে শুয়ে পড়ে শীঘ্রই সে ঘুমিয়ে পড়ল।

বস্তার ভেতর থেকে বিপ্লো যখন তার নাসিকাগর্জন শুনতে পেল, তখন সে একটা ছুরি নিয়ে বস্তার মুখ কেটে বাইরে বেরিয়ে এল।

ভূতটা জেগে উঠে এবং তাকে দেখতে না পেয়ে যাতে সব বুঝতে না পারে, সেইজন্য বিপ্লো বস্তাটিতে কতগুলো পাথর ভরে বস্তার মুখ বেঁধে দিল। তারপর সে দৌড়ে বাড়ী চলল। রাস্তায় যেতে যেতে সে প্রাণ খুলে হাসল। কেননা, ভূতটা বাড়ী গিয়ে শুধু পাথরভরা বস্তাটা দেখতে পেলে কি মজাটাই না হবে!

ভূতটা কিছুক্ষণ ঘুমাল। তারপর যখন নিজেকে বেশ সুস্থ মনে করল, তখন সেই বস্তাটা কাঁধে ফেলে পাহাড়ের উপর নিজের বাড়ীর দিকে চলল।

কিছুদূর গিয়েই সে বস্তাটা কাঁধ বদল করে অন্য কাঁধে নিল। আরো কিছুক্ষণ পর সেটাকে সে অন্যভাবে হাতে ধরে নিয়ে চলতে লাগল। শীঘ্রই সে খুব পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল এবং তার শ্বাস ঘন ঘন পড়তে লাগল। কিন্তু কোথাও এবারও না থেমে সোজা সে বাড়ী চলে এল।

বস্তাটাকে ঘরের মেঝেতে রেখে ভূত তার স্ত্রীকে বলল, বড় কড়াটা উনুনের উপর চাপাও। আমি আজ এক নধর চেহারার ছেলে এনেছি। আজ রাতের মত এমন ভোজ আর কোনদিনই এর আগে হয়নি।

তার স্ত্রী আগুনের উপর কড়া চাপিয়ে দিল। তারপর সে বস্তা থেকে ছেলেটাকে বের করতে তার স্বামীকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো। তারা বস্তার মুখ খুলে কড়ায় উপুড় করে ঢেলে দিল। কিন্তু সুন্দর মোটা ছেলের বদলে মেঝেতে পড়ল এক স্তূপ পাথর।

ভূতটা অবাক্ হয়ে পাথরগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। তার স্ত্রী চীৎকার করে বলল, বস্তার ভেতর কতকগুলো পাথর রেখে কেন মিছে কথা বললে, এতে একটা সুন্দর ছেলে আছে? আমাকে এভাবে বিরক্ত করার মানে কি? সে রেগে গজ্ গজ্ করতে লাগল।

ভূতটা তখন ঘরের অন্যদিকে গিয়ে বলল, নিশ্চয়ই ছিল। আমি নিজের হাতে ছেলেটিকে বস্তায় বন্ধ করেছিলাম। তার নাম বিপ্লো। সে গাছের ডালে বসে ডুমুর খাচ্ছিল। আমার মনে হয়, কেউ ওকে বস্তা থেকে ছেড়ে দিয়েছে। আচ্ছা মজা দেখাচ্ছি, কে একাজ করেছে। এই বলে ভূতটা ফের বেরিয়ে পড়ল।

সে বনে গিয়ে বিপ্লোকে খুঁজল, কিন্তু তাকে পেল না। মাঠে খুঁজেও ফিরে এলো। তারপর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে অবশেষে বিপ্লোকে তাদের বাড়ীর ছাদে বসে থাকতে দেখল।

ভূতটা ছেলেটার সামনে নিজের রাগ আর দেখাল না। ছদ্মবেশ ধরে সে মধুরস্বরে তাকে বলল, খোকা! কি করে তুমি অত উঁচু ছাদে উঠলে?

তুমি কি সত্যই জানতে চাও ?— বিপ্লো জিজ্ঞাসা করে।

হ্যাঁ, ছদ্মবেশী ভূতটা বলল, ওখানে রোদ বেশ সুন্দর আর গরম, তাই আমি তোমার কাছে গিয়ে বসতে চাই।

আচ্ছা, কি করে এখানে আসবে তা বলছি, বিপ্লোর মুখে দুষ্ট হাসি খেলে গেল। তুমি কাচের গেলাস, কাপ, প্লেট, ডিস্ প্রভৃতি জিনিস জোগাড় করে তার উপর উঠে ছাদে চলে এসো। এখানে আসা ত খুবই সোজা।

ভূতটা জানত না যে, বাড়ীর অপর পাশে একটা সিঁড়ি আছে। আর সেই সিঁড়ি দিয়েই বিপ্লো ছাদে উঠেছিল। যাহোক্, ভূতটা নানা যায়গা থেকে কাপ, প্লেট, ডিস্ প্রভৃতি এনে একটা বড় স্তূপ করল, যা ছাদের কাছে পৌঁছায়।

তারপর সে কাচের জিনিষের স্তূপের উপর উঠতে লাগল। তাতে কাচ ভেঙে যেতে লাগল। যতই সে জোরে উপরে উঠতে চেষ্টা করে, ততই কাপ, প্লেটগুলো ভাঙতে থাকে আর নীচের জিনিসগুলো গুঁড়ো হয়ে যেতে লাগল।

অবশেষে সে খুব রেগে গিয়ে চীৎকার করে বলল, আমি উঠবই উঠব। সে ভাবল, এখন যদি একটা লাফ দিই তাহলে একেবারেই ছাদে গিয়ে পৌঁছব। এই ভেবে সে যেমনি এক লাফ দিল, অমনি হুড়মুড় করে এক ভীষণ শব্দ হল।

এদিকে সেই বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা মাঠ থেকে ফিরে এসে যখন দেখল যে, একটা লোক তাদের কাচের আসবাব-পত্রগুলোর উপর লাফাচ্ছে, তখন তারা চীৎকার করে ছুটে এলো। রাগে অন্ধ হয়ে তারা তাকে মারতে লাগল। কিন্তু তখন ভূতটার লাফানির ফলে কাচের জিনিসগুলোর স্তূপ ভেঙে পড়ল। আর ভূতটাও বিপ্লোর বুদ্ধির ফলে ওগুলোর নীচে চাপা গেল।

অভিশাপ ও আশীর্বাদ

(ভারতীয় উপকথা)

চন্দ্র, সূর্য আর বায়ু কি করে তাদের নিজে নিজের রূপ পেল সে-সম্বন্ধে ভারতের উপকথায় সুন্দর এক গল্প আছে। সেইটাই এখানে বল্‌ছি।

বৃদ্ধা মা তারকা অনন্ত আকাশের সর্বোচ্চ এক স্থানে থাকেন। তিনি কখনো নড়তে চড়তে পারেন না। সূর্য, চন্দ্র আর পবন তাঁর ছেলে-মেয়ে। বহুদিন পূর্বে এসব ছেলেমেয়েরা যখন যৌবনপ্রাপ্ত হয়েছিল, তখন তাদের কাকা বজ্র এবং কাকীমা বিদ্যুৎ তাদের এক ভোজে নেমন্তন্ন করেন। বৃদ্ধা মা যেতে পারলেন না। কেননা, তাঁকে সর্বদা রাত্রে তাঁর ঘরে থাকা আর দিনের বেলায় ঘুমানো তাঁর একান্ত প্রয়োজন।

ছেলেমেয়েরা নিমন্ত্রনে গেল। সেখানে নানারকম সুস্বাদু খাদ্য-দ্রব্যের বন্দোবস্ত ছিল। সূর্য ও পবন উভয়েই খুব লোভী আর স্বার্থপর। তারা অনেক খেলে, কিন্তু কিছুতেই তৃপ্ত হল না। কোমলহৃদয়া চাঁদ তাদের মত ছিল না। তার বৃদ্ধা মা তারকা এই সব খাবার খেতে পারলেন না বলে চাঁদ খুবই দুঃখ পেল। তাই সবচেয়ে ভাল খাবারগুলো সে তার মায়ের জন্য একটা ছোট ঝুড়িতে রেখে দিল।

ভোজ শেষ হবার পর ছেলেমেয়েরা বাড়ী ফিরল। সূর্য প্রথমে খুব তাড়াতাড়ি তাপ ছড়াতে ছড়াতে চলল। তারপর চললো পবন। মাঝে মাঝে তারা পথে থামলো, কখন আস্তে, কখন জোরে বাড়ীমুখে চলতে লাগলো। আর সবচেয়ে শেষে চাঁদ চলতে লাগলো হাসতে হাসতে। এক পাহাড়ের আড়ালে সে তার রূপার জুতোর ফিতে বেঁধে নিয়ে চলতে লাগলো।

সূর্য বাড়ী ফিরলে তার মা বললেন, নিশ্চয় তোমার সাধ্যের অতীত বহু খাবার তোমাকে খেতে দেওয়া হয়েছিল। আমার জন্য তার কিছু কি এনেছ?

সূর্য বলল, না, আমি কাকার ভোজে গিয়েছিলাম নিজে খেতে। আমার মায়ের জন্য খাবার আনতে তো আর যাইনি।

কিছুক্ষণ পরে পবন এলে মা জিজ্ঞাসা করলেন, আমার জন্য তুমি কি কিছু খাবার এনেছ ?

পবন বলল, এ প্রশ্ন আমাকে কেন ? আমি তো সেখানে গিয়েছিলাম স্ফূর্তি করতে। তুমি তো আমাকে তোমার জন্য কিছু আনতে বলনি।

বৃদ্ধা মা তারকা কোন উত্তরই করলেন না। তারপর চাঁদ এল হাসতে হাসতে। মা তাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই সে মধুর স্বরে বলে উঠল, মা, এই ঝুড়িতে অনেক সুখাদ্য আছে। এগুলো ভোজ থেকে তোমার জন্য নিয়ে এসেছি। এই বলে চাঁদ ঝুড়ি থেকে সেই খাবারগুলো বার করে দিলো। মা খুব খুশী হলেন।

কিছুক্ষণ পরে মা তারকা তাঁর ছেলেমেয়েদের ডেকে বললেন, তোমরা সকলেই বড় হয়েছ। বাড়ী ছেড়ে নিজের কাজ খুঁজে নেওয়ার বয়স তোমাদের হয়েছে। যাবার সময় আমার বিদায়-বাণী শুনে নাও।

তিনি প্রথমে সূর্যকে আহ্বান করে বললেন,—তুমি যখন শিশু ছিলে, তখন আমি তোমাকে মানুষ করেছি, কত কষ্ট ও বিপদ থেকে উদ্ধার করেছি। আমি তোমার জন্য অনেক দুঃখ সহ্য করেছি। কিন্তু আজ বজ্র ও বিদ্যুতের বাড়ীর ভোজে গিয়ে নিজের কথা ছাড়া আর কারো কথা তোমার মনে স্থান পায়নি। তোমার বৃদ্ধা মায়ের কথা ভাবনি, ভাবনি যে তিনি নড়তে পারেন না এবং খুবই ক্ষুধার্ত। এজন্য তোমাকে শাস্তি নিতে হবে। এর পর থেকে তোমার মুখ সব সময়ই উত্তপ্ত থাকবে ও জ্বলতে থাকবে। তুমি পৃথিবীর বুকে যে কিরণ ছড়াবে তা সকলকে উত্তপ্ত করবে ; তুমি আকাশে উঁচুতে উঠতে থাকলে মানুষ তোমার উপর বিরক্ত হয়ে লুকিয়ে থাকবে। তোমার সম্বন্ধে তারা একটা ভাল কথাও বলবে না।

মায়ের অভিশাপে আজও তাই সূর্যের মুখ জ্বলন্ত ও উত্তপ্ত দেখতে পাও। এমন কি রাত্রে বাড়ী ফিরলেও নাকি সে লজ্জায় ও ক্ষোভে জ্বলতে থাকে।

তারকা মা তারপর পবনকে উদ্দেশ করে বললেন, সূর্যের মত তুমিও খুব স্বার্থপর ও নির্দয়। আমি ক্ষুধার্ত থাকা সত্ত্বেও তুমি খাবার আনোনি। তৃষ্ণার্ত হলেও ঠাণ্ডা কিছু এনে দাওনি। সুতরাং সূর্য যখন পৃথিবীকে তার জ্বলন্ত মুখ দিয়ে শুষ্ক করবে তখন তুমি তৃষ্ণার্ত হয়ে ভীষণ বেগে ছুটাছুটি করতে থাকবে, আর যে জিনিস স্পর্শ করবে সেটাই যাবে শুকিয়ে।

এখন তাহলে তোমরা বুঝতে পারছ, গরম আবহাওয়ায় কেন বায়ুকে কেউ পছন্দ করে না।

তারপর মা চাঁদকে বললেন, তুমি কোমলহৃদয়া ও বিশ্বাসী মেয়ে। আমাকে বৃদ্ধা ও ক্ষুধার্ত জেনে, তুমি খাবার আগে আমার জন্য কিছু রেখে দিয়েছিলে। আমাকে ভালবাস বলেই তুমি এই কাজ করেছিলে। এখন তুমি আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কর।

তুমি সব সময়েই শান্ত-সুন্দর থাকবে, তোমার আলো কাউকে কষ্ট দেবে না। তোমার আলো হবে ঠাণ্ডা ও আরামদায়ক। সব মানুষ তোমাকে ভালবেসে প্রশংসা করবে। তুমি হবে তাদের মাস ও বছরের মাপকাঠি। তোমার জন্যই তারা যথাসময়ে বীজ বুনতে ও ফসল কেটে তুলতে সমর্থ হবে। তোমাকে সবাই আশীর্বাদ করবে আর তুমিও সব সময় সুখী থাকবে।

মায়ের আশীর্বাদ পেয়েই চাঁদ রাতে ঠাণ্ডা ও স্নিগ্ধ আলো ছড়ায়। আজও সে শান্ত, সুন্দর ও সুখকর।

নীল ফুল

(ডেনমার্কের উপকথা)

সেকালে ডেনমার্ক তথা উত্তর দিকের বরফের দেশের সমস্ত লোক বিশ্বাস করতো যে, তাদের বারোজন দেবতা এবং ছাব্বিশজন দেবী।

দেবরাজের নাম হচ্ছে ওডিন। আর এই ওডিন থেকে বুধবারের নাম হয়েছে 'ওয়েনেস্‌ডে'। এই দেবরাজের স্ত্রী হচ্ছেন রাণী ফ্রিগ্‌গা। রাণী হলেও তাঁকে সর্বদা নানা ব্যাপারে ব্যস্ত থাকতে দেখা যেত। তাঁর নিজের একটা সুন্দর রাজপ্রসাদ ছিল—তার নাম 'কুয়াশার ঘর'। এই ঘরে বসে তিনি সোনার চরকা কাটতেন। বরফের দেশের লোকদের বিশ্বাস, তিনি তাঁর চরকায় মেঘ বোনেন এবং তা থেকে তাঁর পোশাক তৈরী হয়। আকাশের দিকে চেয়ে তারা বলে দিতে পারতো যে, আজ ফ্রিগ্‌গা রাণী কোন্ পোশাক পরেছেন। সাদা মেঘ আকাশের গায়ে দেখা দিলে তারা বলে, আজ তিনি সাদা পোশাক পরেছেন। বৃষ্টি পড়লে তারা বলত দেবরাণী আজ তাঁর পোশাক ধুচ্ছেন। আর যখন তুষারপাত হয়, তখন তারা বলে, আজ তিনি তাঁর সাদা পালকের বিছানা ঝাড়ছেন।

এই দেবরাণী কিন্তু পৃথিবীর লোকদের খুব ভালবাসতেন। ডেনমার্ক ও উত্তর ইউরোপে অনেক দেশে তাঁর সম্পর্কে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। তারই একটা এখানে বলবো।

পাহাড়ের উপর এক কুঁড়েঘরে এক গরীব মেষপালক তার স্ত্রীর সঙ্গে বাস করতো। তারা এতই গরীব ছিল যে, তারা সবসময় খেতে পেত না। শরীর গরম রাখার উপযুক্ত পোশাকও তাদের ছিল না। তা সত্ত্বেও তারা বেশ সুখী ছিল। মেষপালকের স্ত্রী তাদের ঘরটাকে সর্বদা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখতো। বাড়ীর আশ-পাশে নোংরা দেখা যেত না।

এতে রাণী ফ্রিগ্‌গা তাদের উপর খুশীই ছিলেন, কেননা, তিনি পরিচ্ছন্নতাই পছন্দ করতেন।

একদিন মেষপালক পাহাড়ের উপর তার মেষগুলো চরাচ্ছে, এমন সময় সে দেখতে পেল, সামনে এক পাথরের উপরে এক সুন্দর হরিণ দাঁড়িয়ে আছে।

আঃ! যদি এই হরিণটাকে ধরতে পারি তাহলে বেশ কিছুদিন আর খাবার ভাবনা ভাবতে হয় না। এই কথা সে মনে মনে বলেই তীরধনুক নিয়ে ছুটল হরিণের পেছনে। মাইলের পর মাইল সে শিকারের পেছনে ছুটল, লক্ষ্য করে কয়েকটা তীরও সে ছুঁড়ল, কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হল।

অবশেষে ক্লান্ত হয়ে মেষপালক একটা পাথরের উপরে বসে পড়ল। হঠাৎ সে হরিণটাকে সামনের এক শিলাখণ্ডের উপর দেখল। দেখেই সে তার দিকে ছুটল, কিন্তু শিলাখণ্ডের উপর গিয়ে দেখল আশে-পাশে কোথাও হরিণটার কোন চিহ্নও নেই। শিলাখণ্ডের পাশে ছিল আর একটি বিরাট পাথর। মেষপালক লক্ষ্য করল, তার একদিকে বড় একটা বিরাট গুহা।

মেষপালক ছিল খুব সাহসী। তাই সে নির্ভয়চিত্তে সেই গুহার ভিতরে ঢুকে পড়ল। ভিতরে ঢুকে মেষপালক দেখে এক পরমাসুন্দরী মেয়ে তাঁর পরিচারিকাদের সঙ্গে বসে আছেন। এই সুন্দরী হচ্ছেন রাণী ফ্রিগ্‌গা। মেষপালক রাণীকে দেখে খুবই ভয় পেল, কিন্তু রাণী তাকে দেখে বললেন, ভয় করো না। তোমার কোনও ক্ষতি হবে না। এখানে যেসব জিনিস দেখছ, তার মধ্যে যেটা ইচ্ছা তুমি বাড়ী নিয়ে যেতে পার।

সেই গুহায় অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস ছিল। সুতরাং সেই মেষপালক ঠিক করতে পারছিল না, সে কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা নেবে। অবশেষে সে দেবরাণীর হাতে একগুচ্ছ খুব সুন্দর নীল ফুল দেখে সেগুলো চাইল।

রাণী বললেন, তুমি সবচেয়ে সুন্দর জিনিসই পছন্দ করেছ, আর এগুলোর সাহায্যে তোমরা ধনী হবে। ফুলগুলো নাও আর বীজের এই থলেটাও নিয়ে যাও।

মেষপালক দুটো জিনিসই গ্রহণ করল। সে রাণীকে যখন ধন্যবাদ দিতে যাবে, তখন একটা বজ্রপাতের শব্দ হল আর সে দেখল গুহায় রাণী বা তাঁর পরিচারিকা কেউই নেই। কেবল সে-ই একলা গুহার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে।

তারপর মেষপালক বাড়ী গিয়ে তার স্ত্রীকে সমস্ত কথা বলে সেই ফুল আর বীজের থলেটি দিল। তার স্ত্রী শুনে বলল, তুমি এগুলো না নিয়ে যদি একটা হীরা আনতে তাহলে বেশ ভাল হত। এসব অপ্রয়োজনীয় জিনিস এনে কি লাভ হল?

মেষপালক কিন্তু সেই বীজগুলো তার জমিতে বুনে দিল। অল্পদিনের মধ্যেই সবুজ গাছ অঙ্কুরিত হয়ে উঠল। কিছুদিন পরে সেই গাছে ফুটল নীল ফুল। আবার ফুল শুকিয়ে গিয়ে হল বীজ। তারপর একদিন একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। একদিন রাত্রে রাণী ফ্রিগ্‌গা মেষপালকের বাড়ীতে এক বৃদ্ধা রমণীর বেশে এলেন। তিনি মেষপালক আর তার স্ত্রীকে কি করে ঐসব গাছ থেকে সূক্ষ্ম লিনেন কাপড় তৈরী করতে হয় তার উপায় বলে দিলেন।

দেশের লোকে যখন মেষপালককে নতুন কাপড় তৈরী করতে দেখলো, তখন তাদের কেউ কেউ তার কাছ থেকে বেশী দাম দিয়ে সেই সব কাপড় কিন্‌ল, কেউ-বা আবার কিন্‌ল সেই নীল ফুলগাছের বীজ। এভাবে রাণী ফ্রিগ্‌গার কথামত মেষপালক এবং অন্যান্য বহুলোকই অল্পদিনের মধ্যে বেশ ধনী হয়ে উঠলো।

———

তিনটি পশু

(ইংলণ্ডের উপকথা)

একজন লোক টাকা-পয়সার দিক দিয়ে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ভাবল, যে, সে অন্যদেশে গিয়ে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করবে।

লোকটা একদিন তার বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল। পথে যেতে যেতে এক জায়গায় দেখল, কতকগুলো ছেলে খুব গোলমাল করছে। লোকটা জিজ্ঞাসা করলো, তোমরা হৈ-চৈ করছ কেন ?

ছেলেদের দল বলল, আমরা একটা ইঁদুর ধরেছি। দেখ, সে কেমন লাফাচ্ছে আর দৌড়াচ্ছে।

বেচারী ইঁদুর খুব ভয় পেয়েছে। আমি তোমাদের কিছু পয়সা দিচ্ছি, আমাকে এ ইঁদুরটা দিয়ে দাও।—লোকটা বলল।

ছেলেরা এ প্রস্তাবে রাজি হলে, সে ইঁদুরটা নিয়ে এক মাঠের মধ্যে ছেড়ে দিল।

কিছুদূর গিয়ে একজায়গায় সে দেখল, কয়েকটা ছেলে একটা গাধাকে দু পায়ে দাঁড় করাবার চেষ্টা করছে। গাধাটা কিন্তু প্রতিবারেই পড়ে যাচ্ছে।

লোকটা বলল, গাধার তো আর দু পায়ে দাঁড়াবার অভ্যাস নেই সুতরাং ও পড়ে যাবেই। বরং আমাকে গাধাটা দাও, তার বদলে কিছু টাকা নাও। ছেলেরা তাই করলে। লোকটা গাধাটাকে নিয়ে এক বনে ছেড়ে দিল।

আর এক জায়গায় সেই লোকটা দেখল যে কতকগুলো লোক একটা ভালুক ধরেছে। তারা ভালুকটাকে নাচাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু ভালুকটার মন ভাল না থাকাতে সে নাচছে না। লোকটা এ ব্যাপার দেখে কিছু অর্থের বিনিময়ে ভালুকটাকেও নিয়ে বনের ভিতর ছেড়ে দিল। আর দুটো পশুর মত ভালুকও মনের আনন্দে চলে গেল।

এসব ব্যাপারে সেই লোকটার প্রায় সমস্ত অর্থই শেষ হয়ে গেল। সে রাজপ্রাসাদের কাছে এসে ভাবল, রাজার অনেক ধনসম্পত্তি। তা থেকে আমি যদি কিছু নিই, তাহলে রাজা নিশ্চয়ই রাগ করবেন না। আবার নিজের টাকা হ'লে রাজাকে ফেরৎ দিলেই চলবে।

এই না ভেবে সে রাজপ্রাসাদের ভিতর ঢুকে কিছু টাকা চুরি করল, কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময় রাজার লোকরা তাকে ধরে ফেলল। তারা তাকে রাজার কাছে নিয়ে গেল। রাজা আদেশ দিলেন, ওকে একটা বাক্সের ভেতর বন্ধ করে সমুদ্রে ফেলে দাও।

রাজকর্মচারীরা তখন একটা বড় কাঠের বাক্সে লোকটাকে বন্ধ করে তার ভিতর একটা রুটি ও একপাত্র পানীয় জল রেখে তাকে সমুদ্রে ফেলে দিল।

বাক্সটা ছিল খুব বড় আর কাঠের তৈরী ; সুতরাং বাক্স জলে না ডুবে জলের উপর ভাসতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে লোকটা বাক্সের উপরে এক ভীষণ শব্দ শুনলো এবং তার কিছুক্ষণ পরে বাক্সের উপরে একটা বড় গর্তের সৃষ্টি হল। লোকটা সেই গর্তের ভেতর দিয়ে বাইরে মাথা গলিয়ে দেখল, একটা ইঁদুর সেখানে বসে আছে। কাঠ কেটে ইঁদুরটাই ঐ গর্ত করেছিল।

তারপর গাধা আর ভালুক বাক্সটাকে সমুদ্রের তীরে এনে তুলল। লোকটা তখন বাক্স থেকে বাইরে এলো। সে তাদের উপকার করেছিল বলেই পশুরা তার সাহায্য করল।

তারা যখন সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়েছিল, তখন তারা একটা সাদা পাথর দেখতে পেল। পাথরটা বেশ চমৎকার দেখতে। ভালুক বলল, আমি জানি ওটা কোন্ পাথর। ওটা হচ্ছে এক যাদুকরের পাথর। এটা হাতে নিয়ে তুমি যখন যা ইচ্ছা চাইবে, তখনি তা পাবে।

লোকটা তখন পাথরটা হাতে নিয়ে বলল, আমি একটা বড় বাড়ী, একটা সুন্দর বাগান আর কিছু টাকা চাই।

মুহূর্তের মধ্যে লোকটা দেখতে পেল, সামনে এক বিরাট বাড়ী আর

সুগন্ধ কুসুমশোভিত সুন্দর এক বাগান। লোকটা বাড়ীর দিকে গেলে ভৃত্য দরজা খুলে দিল। সে বেশ আনন্দে সেই বাড়ীর মধ্যে বাস করতে লাগলো।

এর মধ্যে একদিন তিনজন লোক ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। তারা এই বাড়ী আর বাগান দেখে বলল, এ কি করে হতে পারে ? আমরা কিছু আগে দেখেছি এখানে, কিছুই নাই আর এখন দেখছি এক অদ্ভুত ব্যাপার !

কি করে এত তাড়াতাড়ি এই বাড়ী আর বাগান হল তা তাদের জানবার ইচ্ছা হল। তারা বাড়িতে ঢুকে সেই লোকটাকে জিজ্ঞাসা করল, কি করে তুমি এই বাড়ি আর বাগান এত অল্প সময়ে তৈরি করলে ? সে উত্তর দিল, আমি এ সব তৈরি করিনি, এক যাদুকরী পাথর এসব এনেছে।

লোকগুলো তখন পাথরটা দেখতে চাইলে, সে তাদের সেই শ্বেত পাথরটা দেখতে দিল। তাদের একজন পাথরটাকে হাতের ভিতর নিয়ে হঠাৎ বলে উঠল, এই বাড়ি-বাগান শহরে নিয়ে যাও, আর সেই সঙ্গে আমাকে ও আমার দু'বন্ধুকেও সেখানে নিয়ে চল।

হঠাৎ সব যেন গোলমাল হয়ে গেল। তখন লোকটা দেখল, সে সমুদ্রের তীরে পড়ে রয়েছে—সেই বাড়ি আর বাগান অদৃশ্য হয়েছে। তার এক পাশে কাঠের বাক্সটি, একবাটি জল এবং একটা রুটি পড়ে আছে, আর অন্যদিকে বসে আছে ইঁদুর, ভালুক আর গাধা।

ভালুক অবশেষে সেই লোককে বলল, বাড়িটা শহরে চলে গিয়েছে। সমুদ্রের ওপারে সেই শহর। তুমি এখানে অপেক্ষা কর, আমরা সেখানে গিয়ে পাথরটা নিয়ে আসছি।

গাধা তখন জলে নামল। ইঁদুর গাধার মাথায় এবং ভালুক তার পিঠে চড়ল। গাধা তারপর সাগর সাঁতরে অপর পারে এল।

তারা নগরের ভেতর সেই বাড়িটা দেখল। ভালুক তখন ইঁদুরকে বলল, তুমি ভিতরে গিয়ে দেখ, পাথরটা কোথায় আছে। তুমি খুব ছোট ; সুতরাং তোমাকে কেউ লক্ষ্য করবে না।

তখন ইঁদুর বাড়ির ভেতরে গিয়ে শীঘ্রই ফিরে এল এবং বলল, পাথরটা

হস্তগত করা বড়ই কঠিন। যে ঘরে লোকগুলো ঘুমায়, সে ঘরে ওটা একটা টেবিলের উপর আছে। আর তার ঠিক দু'পাশে দু'টো বিড়াল পাথরটাকে পাহারা দিচ্ছে।

ভালুক বলল, অপেক্ষা কর। রাত হলে তুমি ঘরে গিয়ে একটা লোকের নাক কামড়ে দেবে। তারপর কি করা যায়, দেখা যাবে।

ভালুকের কথায় ইঁদুর রাতের অপেক্ষায় রইল। তারপর রাত হলে সে সেই ঘরে গেল এবং বিছানায় উঠে গিয়ে সে একটা ঘুমন্ত লোকের নাকে জোরে কামড়ে দিল। লোকটা জেগে উঠে ক্রোধে অন্ধ হয়ে চীৎকার করে উঠল, ঘরে দু' দুটো বিড়াল পোষা থাকতে ইঁদুর আমার নাক কামড়াল। এ বিড়ালগুলো একেবারেই অকেজো। এই বলে সে বিড়াল দু'টোকে ঘরের বাইরে রেখে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

ইঁদুর তখন লাফিয়ে উঠল টেবিলের উপর। তারপর পাথরটাকে গড়িয়ে টেবিল থেকে মেঝেতে ফেলল এবং সেটা নিয়ে দরজার কাছে গেল। তারপর আর ওটা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারল না। সে তখন ভালুককে ডাকল। ভালুক পাথরটাকে তুলে নিয়ে ইঁদুরের সংগে তাড়াতাড়ি সমুদ্রতীরে চলল, সেখানে গাধা অপেক্ষা করছিল। গাধা পাথরটাকে তার মুখের ভিতর রাখল। তারপর ইঁদুর গাধার মাথার উপর এবং ভালুক তার পিঠে চড়ে বসল।

যখন তারা সমুদ্রের ওপারের কাছাকাছি এসেছে তখন ভালুক বলল, আমিই পাথরটা আনলাম। ইঁদুর প্রতিবাদ করে বলল, না, এ আমিই এনেছি। ভালুক তখন গাধাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি বল ? গাধা উত্তর দিল, ইঁদুর একাজ করেছে আর তুমি তাকে সাহায্য করেছ মাত্র।

এদিকে কিন্তু গাধা এই কথা বলামাত্র তার মুখ থেকে সেই পাথরটা জলের ভিতর পড়ে হারিয়ে গেল।

ভালুক বলল, আমরা যে কি করলাম তা বুঝছি। সেই বলে সে সমুদ্রের সমস্ত মাছকে ডাকল। মাছেরা এলে সে বলল, এক বিরাট জন্তু

তোমাদের খেতে এই সমুদ্রে আসছে। আমাকে কতকগুলো পাথর এনে দাও, যাতে জন্তুটা আসতে না পারে সেজন্য একটা দেয়াল তৈরী করব।

এই কথা শুনে সমস্ত মাছ ভয় পেয়ে পাথর আনতে লাগল। অবশেষে একটা বুড়ো মোটা মাছ সেই যাদুকরী পাথরটা আনল। সে মাছদের রাজা। রাজা বলল, এই যে, এটাই হচ্ছে এই সমুদ্রের শেষ পাথর।

ভালুক তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বলল, সেই জন্তুটা আর এখন আসবে না, সে অন্য পথে চলে গিয়েছে। সুতরাং তোমরা এখন নির্ভয়ে থাকতে পার।

তারপর ইঁদুর, গাধা আর ভালুক সেই যাদুকরের পাথরটা লোকটার হাতে দিলে, সে বলল, আমার বাড়িঘর সব আবার ফিরে আসুক। মুহূর্তের মধ্যেই বাড়ি, বাগান প্রভৃতি আবার যথাস্থানে এল। সেই লোকটি তখন সেই ইঁদুর, গাধা আর ভালুকের সংগে সেই বাড়িতে পরম আনন্দে দিন কাটাতে লাগল।

জেলের গল্প

(আরব উপকথা)

এক জেলে—সে ছিল খুব গরীব আর বৃদ্ধ। প্রতিদিন সকালে সে কাজে বার হতো। কিন্তু তার একটা নিয়ম ছিল, সে চারবারের বেশি সমুদ্রে কখনও জাল ফেলত না।

তখনও চাঁদ ডুবেনি, এমন ঠিক সময় জেলে সমুদ্রে জাল ফেলল। জাল ওঠাতে কিন্তু বেশ ভারী লাগলো দেখে জেলে ভাবল, আঃ, কি ভারী—এবার অনেক মাছ ধরা পড়েছে। কিন্তু জাল উঠিয়ে দেখল যে জালে একটা মরা গাধা উঠেছে। জেলে সেটা সমুদ্রে ফেলে দিয়ে আবার জাল ফেলল।

এবারও জাল খুব ভারী লাগলেও কোন মাছই উঠল না, শুধু এক ঝুড়ি কাদাবালি। তৃতীয়বার সে জাল ফেলল, এবার উঠলো পাথর, ঝিনুক, শাঁখা প্রভৃতি।

দিন শেষ হয়ে আসছে। দিনের শেষে জেলে তার প্রার্থনা শেষ করল। সে ভগবানের কাছে জানাল—হে প্রভু! আমি চারবারের বেশি কোনদিন সমুদ্রে জাল ফেলি না। কিন্তু আজ তিনবার জাল ফেললেও কিছু উঠল না। আমি প্রার্থনা করি, হে প্রভু, এবার আমার প্রতি সদয় হও।

চতুর্থবার সে জাল ফেলল। এবারও কোন মাছ উঠল না; কিন্তু উঠল একটা তামার কারুকার্যখচিত পাত্র। পাত্রটি খুব ভারী, সুতরাং এর ভেতর কিছু থাকা সম্ভব। জেলে ভাবল আমি এই পাত্রটি বিক্রী করলে একশোটা মাছের দামের চেয়ে বেশি দাম পাব।

প্রথমে তার কৌতূহল হল কলসীর ভেতর কি আছে তা দেখবার। ছুরি নিয়ে পাত্রের ঢাকনা কেটে ফেলতেই কলসী থেকে ধোঁয়া বের হ'তে আরম্ভ করল। দেখতে দেখতে সেই ধোঁয়া বাইরে এসে একটা মেঘের

সৃষ্টি করল, তারপর সাধারণ দৈত্যের চেয়ে দ্বিগুণ বড় একটা দৈত্য সেই পাত্র থেকে বার হয়ে এল।

জেলে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করল ; কিন্তু ভয়ে আর এক পাও এগুতে পারল না।

দৈত্য চীৎকার করে বলল, সোলোমন, সোলোমন, তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমি কখনই তোমার বিরুদ্ধাচরণ করবো না।

একথা শুনে জেলের সাহস বাড়ল। সে বলল—তুমি কি বলছ? সোলোমন তো আঠারশ' বছর আগে মারা গিয়েছেন। বল, কেন তুমি এই কলসীতে বন্ধ ছিলে?

দৈত্য বলল, আমি তোমাকে হত্যা করার আগে তুমি আমার সংগে নম্রভাবে কথা বল।

আমাকে মারবে কেন?—জেলে জিজ্ঞাসা করল। আমি তোমাকে মুক্তি দিয়েছি। তুমি কি ভালোর বদলে মন্দ করবে?

হ্যাঁ, আমি তোমাকে হত্যা করবোই। তবে তুমি একজন ভাল জেলে বলে তোমাকে আমি একটা বর দিতে চাই।

জেলে জিজ্ঞাসা করে,—কি বর দেবে?

তুমি কিভাবে মরতে চাও, সেটা তুমি ইচ্ছামত ঠিক করতে পারবে।

এই বলে দৈত্যটা বলতে লাগল, আমার গল্প শোন। আমাকে শাস্তি দেবার জন্য রাজা সোলোমন এই পাত্রের ভিতর আমাকে বন্ধ রেখেছিলেন। তিনি পাত্রটা এক দৈত্যকে দেন, সে আমাকে সমুদ্রে ফেলে দেয়। তখন আমি এই প্রতিজ্ঞা করি যে, আমাকে প্রথম একশো বছরের মধ্যে যে মুক্ত করবে, তাকে আমি প্রচুর ধনদৌলত দিব। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে কেউ আমাকে মুক্ত করল না। তারপর আরও দু যুগ চলে গেল, আমিও বদ্ধ হয়ে রইলাম। তখন আবার প্রতিজ্ঞা করলাম, যে এবার আমাকে মুক্ত করবে, আমি তাকে মেরে ফেলব। কিন্তু সে কি ভাবে মরতে চায়, সেটা তাকেই ঠিক করতে দিব।

জেলে দেখল মহা বিপদ। তবু বলল, তোমার প্রতিজ্ঞা ফিরিয়ে নাও, ভগবান তোমাকে ক্ষমা করবেন।

দৈত্য বলল—না, তোমাকে অবশ্যই মরতে হবে।

জেলে তখন ভয়ে মুর্চ্ছা যাবার অবস্থা, তবু সে সাহস করে দৈত্যকে বলল, ঈশ্বরের ইচ্ছায় যা হয় হবে। কিন্তু আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।

তাড়াতাড়ি বল।

জেলে বলল, আমি জানতে চাই, তুমি সত্য সত্যই এই পাত্রে ছিলে কিনা। আমি এটা সহজে বিশ্বাস করতে পরছিনা। তুমি কি ঈশ্বরের পবিত্র নামে শপথ করে বলতে পার ?

দৈত্য মাথা নাড়লে। জেলে তখন হেসে বলল, এই পাত্রটা তোমার একটা পায়ের চেয়েও ছোট। সুতরাং তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রমাণ কর, তুমি এর মধ্যে ছিলে, ততক্ষণ তোমাকে বিশ্বাস করি কি করে ?

আচ্ছা দেখাচ্ছি, এই বলে দৈত্যটা ধোঁয়ায় পরিবর্তিত হল, তারপর আস্তে আস্তে পাত্রের ভেতর ঢুকে গেল। দৈত্য এবার জিজ্ঞাসা করল, আমি সত্য কথা বলছি বলে, তোমার বিশ্বাস হলো ত ?

দাঁড়াও—বলে জেলে তাড়াতাড়ি পাত্রের মুখটা ঢেকে দিল।

তারপর বলল, এবার তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করার পালা। কিন্তু না, তোমাকে আমি আবার সমুদ্রে ফেলে দেব। আর এইখানে এক বাড়ী করে বাস করব। যারা মাছ ধরতে আসবে তাদের সতর্ক করে দেব, যাতে তুমি কোনদিন আর মুক্তি না পাও।

দৈত্যটা জেলের মন গলাতে খুবই চেষ্টা করল। অবশেষে জেলে বলল, তুমি যদি ঈশ্বরের নামে প্রতিজ্ঞা কর যে, আমার কোন ক্ষতি করবে না, তাহলে কলসীটা খুলতে পারি।

দৈত্যটা যে কোন প্রতিজ্ঞা করতে রাজী ছিল। দৈত্য অনুরূপ প্রতিজ্ঞা করার পর জেলে পাত্রের মুখ আবার খুলে দিল। দৈত্যও পাত্র থেকে বেরিয়ে এল।

দৈত্য বলল, তোমার জাল নিয়ে আমার সংগে এস। কি করে ধনী হ'তে হয়, তা তোমাকে দেখাব।

তুজনে তখন এক উঁচু পাহাড় পার হয়ে এক পুকুরের কাছে এল। পুকুরের চারধারেই পাহাড়।

দৈত্য বলল, এই পুকুরে তোমার জাল ফেল।

জেলে জাল ফেলে কিছুক্ষণ পর যখন জাল উঠালো, তখন সে দেখল যে চারটি সুন্দর রঙিন মাছ তার জালে ধরা পড়েছে। চারটি কিন্তু বিভিন্ন রংয়ের—লাল, সাদা, নীল এবং হলদে।

দৈত্য বলল, এই মাছগুলো নিয়ে রাজপ্রাসাদে গিয়ে সুলতানকে দেবে। তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে এত টাকা দেবেন, যা তুমি জীবনে কোনদিন পাওনি। তুমি এখানে রোজ এসে মাছ ধরবে। কিন্তু প্রত্যহ একবারের বেশি জাল ফেললে তোমার অমংগল হবে।

এই বলে দৈত্যটা মাটিতে পদাঘাত করল। এতে মাটি তু'ভাগ হয়ে গেল আর দৈত্য তার ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

জেলে তখন সেই মাছ চারটি নিয়ে রাজপ্রাসাদে গেল। সুলতান মাছ দেখে খুবই আনন্দিত হয়ে জেলেকে চার শত স্বর্ণমুদ্রা দিতে আদেশ করলেন। তিনি জেলেকে বললেন, সে যদি প্রতিদিন এই রকম চারটি মাছ আনতে পারে, তাহলে এই মূল্য তিনি রোজ তাকে দেবেন।

জেলের পক্ষে যে এ খুব আনন্দের সংবাদ, তা বলাই বাহুল্য। এর পর জেলে কোনদিন আর অভাবে পড়েনি।

পিটারের লাভ

(সুইডেনের উপকথা)

পাহাড়ের গায়ে ছিল পিটার নামে একজন লোকের বাড়ি, আর সেইখানেই ছিল তার জমি। পিটার আর তার স্ত্রী সেখানে খুব সুখে বাস করতো। পরস্পর পরস্পরকে খুই ভালবাসতো বলে কেউ কারো কাজের দোষ ধরার চেষ্টা করতো না।

পিটার তার জমিজমা থেকে বেশ কিছু সঞ্চয় করেছিল। তার দুটো গরু ছিল। একদিন পিটারের স্ত্রী তাকে বলল, আমি মনে করি যে আমাদের দুটো গরুর একটাকে বিক্রী করে দিলে ভাল হয়। তাহলে আমাদের হাতে টাকা আসবে আর সঞ্চিত ধনে হস্তক্ষেপ করার কোনো প্রয়োজন হবে না। এ ছাড়া অন্য সুবিধাও আছে। দুটো গরুর বদলে তখন একটা গরুর দেখাশোনা করতে হবে।

পিটার ভাবল যে তার স্ত্রী ঠিক কথাই বলেছে। তাই সে একটা গরু নিয়ে নিকটবর্তী শহরের দিকে চলল। কিন্তু শহরের বাজারে গিয়ে দেখল, তার গরু কেনবার খদ্দের নাই।

বেশ! আমি গরুটাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাব ; বিক্রী আর করবো না—এই না ভেবে পিটার গরুটাকে নিয়ে বাড়ির পথ ধরল।

যখন সে কিছুদূর গিয়েছে, তখন সে একটা লোককে একটা ঘোড়া নিয়ে যেতে দেখল। পিটার ভাবল, একটা গরুর চেয়ে একটা ঘোড়া অনেক ভাল। সে লোকটাকে গরুটা দিয়ে তার বদলে ঘোড়াটা নিল।

কিছুদূর যাবার পর সে একটা লোককে একটা মোটা শূয়োর তাড়িয়ে নিয়ে আসতে দেখল। পিটার ভাবল—একটা ঘোড়ার চেয়ে একটা মোটা শূয়োর ঢের ভাল। এই ভেবে সে লোকটার শূয়োরের সংগে তার

ঘোড়া বিনিময় করল। এর পর কিছুদূর গেলে, একটা ছাগল ও তার মালিকের সংগে তার দেখা হল। পিটার ভাবল, শূয়োরের চেয়ে ছাগলই ভাল। এই ভেবে সে শূয়োরটি দিয়ে ছাগলটাকে নিল।

তারপর পিটার অনেকদূর গিয়ে একটা লোকের দেখা পেল, তার সংগে একটা ভেড়া ছিল। সে ছাগলটার বদলে ভেড়াটি নিল।

কিছুক্ষণ পরে আবার সে একটা লোককে সেই ভেড়াটি দিয়ে তার রাজহাঁসটা নিল। তারপর অনেকক্ষণ পথ চলার পর সে একটা লোককে একটা মোরগ হাতে করে আসতে দেখল। পিটার রাজহাঁসের বদলে মোরগটি নিয়ে ভাবল একটা রাজহাঁসর চেয়ে একটা মোরগ নিশ্চয়ই অনেক গুণে ভাল।

এদিকে সারাদিন পথ চলার পর সে খুবই ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ল। সুতরাং মোরগটা এক শিলিং দামে বিক্রী করে খাবার কিনে খেল। পিটার তখন ভাবল—একটা মোরগ রাখার চেয়ে নিজের জীবন বাঁচান অনেক অংশে ভাল।

তারপর বাড়ির কাছে পৌঁছে সে তার এক বন্ধুর বাড়িতে গেল। বন্ধু জিজ্ঞাসা করল, নগরে গিয়ে কি রকম লাভ হল? পিটার বলল, এই এক রকম। আমি আমার ভাগ্যের প্রশংসা করবো না, কিংবা তার দোষও দেব না। এই বলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে সব বলল।

বন্ধু বলল, তুমি বাড়ি গেলে নিশ্চয়ই তোমার স্ত্রী তোমাকে এজন্য তিরস্কার করবে।

পিটার তাকে বাধা দিয়ে বলল, আমি যা করেছি, তা হয়তো খুব উচিত হয়নি। তবে আমার স্ত্রী কখনই আমি যা করেছি, তার সম্বন্ধে কোন কিছু আলোচনা করবে না।

বন্ধু বলল, তুমি যা বললে, তা আমি বুঝতে পারছি; কিন্তু তোমার কথা মেনে নিতে পারছি না।

পিটার বলল, বেশ, আমার বাড়িতে এখন একশো পাউণ্ড জমানো আছে। আমার স্ত্রী আমাকে তিরস্কার করলে সেগুলো তুমি পাবে, কিন্তু

সে যদি আমার বিপক্ষে একটা কথাও না বলে তাহলে তোমাকে একশো পাউণ্ড দণ্ড দিতে হবে।

বন্ধু এ প্রস্তাবে সানন্দে রাজী হল। তখন পিটার তাকে নিয়ে তার বাড়ির দিকে গেল এবং বন্ধুকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে সব কথা শুনতে বলে দিল।

ঘরের ভিতরে ঢুকতেই পিটারের স্ত্রী বলল, যাক্, নির্বিঘ্নে ফিরে এসেছ! তারপর শহরে গিয়ে কি লাভ হল?

বিশেষ কিছু নয়,—পিটার বলল। শহরে গিয়ে দেখলাম যে গরুটা কেনবার মত লোক সেখানে নাই। সুতরাং আমি একটা ঘোড়ার বদলে ওটাকে দিয়ে এলাম।

ঘোড়ার বদলে?—তার স্ত্রী বলে,—বেশ ভালই হল। আমরা এখন ঘোড়ায় চড়ে সহজেই গির্জায় যেতে পারব। ও, খোকা! ঘোড়াটাকে বেঁধে রাখ।—সে ছেলেকে ডেকে বলে!

আহা! আমার কাছে কিন্তু ঘোড়া নেই। রাস্তায় আমি একটা শূয়োরের সংগে সেটাকে বদলে নিয়েছি।—পিটার বলে।

তার স্ত্রী বলল—খুব ভাল কথা। তুমি আমার মনঃপূত কাজই করেছ, তোমাকে হাজার বার ধন্যবাদ। এখন আমি শূয়োর মাংস দিয়ে অতিথিদের পরিতৃপ্ত করতে পারব। খোকা, শূয়োরটাকে বেঁধে রাখ।

আমার কাছে কিন্তু এখন শূয়োরটা নেই, পিটার বলল, কেননা রাস্তায় আমি এটার বদলে একটা ছাগল পেয়েছি।

তুমি সুন্দর জিনিষই পেয়েছ! আমি শূয়োর দিয়েই বা কি করতাম? এখন ছাগল আসায় দুধ পাওয়া যাবে। ও খোকা! ছাগলটাকে দেখ তো!

না, ছাগলও কিন্তু নেই। রাস্তায় আবার এটাকে এক সুন্দর ভেড়ার বদলে দিয়ে দিয়েছি।—পিটার বলল।

সত্যিই তো ছাগল দিয়ে কি হতো! পাহাড়ে তাকে চরাতেই তো অর্ধেক দিন কেটে যেত। এখন ভেড়া থেকে আমাদের কাপড়ও হবে, মাংস খাওয়াও চলবে।

কিন্তু আমার কাছে এখন আর ভেড়াও নাই, কেননা তার বদলে আমি এক রাজহাঁস নিয়েছি।

ধন্যবাদ! ভেড়া দিয়ে আমি কি করতাম? এখন রাজহাঁসের মাংস খাওয়া চলবে, তার পালক দিয়ে বিছানা-বালিশও হবে। খোকা রাজহাঁসটা নিয়ে এস।

আহা! আমার কাছে রাজহাঁসও নাই। পথে আমি ওটার বদলে একটা মোরগ নিয়েছি।

তার স্ত্রী বলল, আমার মনের মত কাজই করেছ। মোরগ! ঘড়ির মতই ও সুন্দর। ঠিক চারটে বাজার সময় জানিয়ে দেবে। তাহলে আমরা ঠিক সময়ে উঠতে পারব। ও খোকা, দৌড়ে গিয়ে মোরগটা নিয়ে আয়।

পিটার বলল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার কাছে মোরগটাও নেই। রাস্তায় চলতে চলতে আমি এমনই ক্ষুধার্ত হয়ে উঠলাম যে, মোরগটাকে এক শিলিং-এ বিক্রী করে খাবার কিনলাম। কেননা, ভয় পেয়েছিলাম অনাহারে মারা যাব বলে।

তার স্ত্রী বলল, তুমি যা করেচ, ঠিকই করেছ। মোরগ রেখেই বা কি হত? আমরা আমাদের নিজেদের প্রভু এবং আমাদের ইচ্ছামত বিছানায় শুয়ে থাকতে পারি। তুমি সমস্ত ভাল কাজই করেছ; তুমি যে ভালভাবে ফিরে এসেছ, তাতেই আমি সুখী।

তারপর পিটার দরজার বাইরে দণ্ডায়মান বন্ধুকে বলল, এখন তাহলে তোমার বলার কিছু আছে? আমি নিশ্চয়ই একশ পাউণ্ড লাভ করেছি।

পিটারকে একশ পাউণ্ড দিতে বাধ্য হল পিটারের বন্ধু।

অভিশপ্ত জাহাজ

(হল্যাণ্ডের উপকথা)

সে অনেকদিন আগেকার কথা। এক ওলন্দাজ জাহাজ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে পাড়ি জমাচ্ছিল হল্যাণ্ডের পথে। তখন পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে হল্যাণ্ডের প্রভুত্ব। বহু গরীব যুবক সেখানে গিয়ে ধনী হয়ে ফিরে আসত।

দায়াড্রিচ ছিল এই রকম এক যুবক। তার পিতামাতা কেউ ছিল না। সে তাই জাভায় চলে আসে এবং এক ধনীর অধীনে কাজ করতে থাকে। সে কঠোর পরিশ্রম করত, আর ছিল খুব বিশ্বাসী। ধীরে ধীরে অর্থ সঞ্চয় করে সে কিছুদিনের মধ্যে খুব ধনী হয়ে উঠল।

ধনী হলেও দায়াড্রিচ ভুলে যায়নি কি কঠোর পরিশ্রম তাকে করতে হয়েছে। তাই সৌভাগ্যের শিখরে আরোহণ করে সে একটা পরিকল্পনা করল। জাভায় তার যে সমস্ত জমি-জমা, বাড়ি-ঘর ছিল, সে সব বেচে দিল। সমস্ত বিক্রী করে যা অর্থ পেল, তা একটা থলেতে ভরে হল্যাণ্ডের পথে যাত্রা করল। এই জাহাজেই সে চলেছিল স্বদেশ অভিমুখে।

দায়াড্রিচই ছিল একমাত্র যাত্রী। কিন্তু সে মিশুক লোক, সুতরাং শীঘ্রই কাপ্টেন এবং অন্যান্য নাবিকদের সংগে বেশ আলাপ জমিয়ে ফেলল। একদিন জাহাজ যখন উত্তমাশা অন্তরীপের কাছে, তখন দায়াড্রিচ কাপ্টেনের সংগে তার বাল্যজীবন নিয়ে আলোচনা করছিল।

দায়াড্রিচ কাপ্টেনকে জিজ্ঞাসা করল, আপনাকে যখন আর সমুদ্রে ঘুরতে হবে না, অর্থাৎ আপনি যখন বেশ ধনী হবেন, তখন আপনি কি করবেন ?

কাপ্টেন তখন তার পাইপে অগ্নিসংযোগ করে বলল, আম্স্টার্ডাম নগরের বাইরে খালের ধারে একটা ছোট বাড়ি আছে। আমি সেই

বাড়িটা কিনে নেব। গরমের সময় বাগান-বাড়িতে থাকব। সারাদিন ধূমপান করব, আমার স্ত্রী আমার সংগে গল্প করবেন, আর আমার ছেলেমেয়েরা খেলাধূলা করে সময় কাটাবে।

আপনার তাহলে ছেলেমেয়ে আছে ?

হ্যাঁ আছে, এই বলে কাপ্টেন তাদের নাম, বয়স এবং গুণ বর্ণনা করল। বর্ণনার ভংগীতে এসব শুনতে ভালই লাগল দায়াদ্রিচের। তারপর কাপ্টেন জিজ্ঞাসা করল, আর আপনি কি করতে চান ?

দায়াদ্রিচ বলল, আমার স্ত্রীও নেই, ছেলেমেয়েও নেই। হল্যাণ্ডে এমন কোন লোক নেই যে, আমাকে বাড়ি ফিরতে দেখে আনন্দিত হবে। এই বলে তাকে কিভাবে দারিদ্র্যের মধ্যে কাল কাটাতে হয়েছে, কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে, সে-সব কথা সে কাপ্তেনকে বলল। তারপর সে তার পরিকল্পনাটি কাপ্টেনের কাছে বলতে লাগল, আমি বহু টাকা করেছি পরিশ্রমের জোরে। সেগুলো আমি সংগেই নিয়ে চলেছি। আমার একটা পরিকল্পনা আছে। আম্স্টার্ডামের এমন অনেক গরীব ছেলে আছে, যাদের বাড়ি-ঘর নাই। আমি একটা বিরাট বাড়ি তৈরি করে বাস করব এবং আম্স্টার্ডামের মধ্যে সবচেয়ে বড় এক পরিবারের কর্তা হব। নগরের দুঃস্থ, অনাথ ছেলেমেয়েদের সাদরে গ্রহণ করব। তারাই আমার ছেলেমেয়ে।

কাপ্টেন বলল, আপনি তখন তাদের আমার বাড়ি নিয়ে যাবেন। আপনার আর আমার ছেলেমেয়েরা একত্রে খেলা করবে।

এভাবে তারা অনেকক্ষণ বসে বসে গল্প করল। রাত্রি ঘনিয়ে এলে তারা নিজ নিজ কেবিনে চলে গেল।

এদিকে তারা যখন গল্প করছিল, তখন তাদের কথাবার্তা প্রধান খালাসী সব শুনেছিল। দায়াদ্রিচের সংগে টাকার থলি আছে শুনে তার খুব লোভ হল। সে অনেক চিন্তা করে দেখল, একা ঐসব ধন হস্তগত করা খুব কঠিন হবে। সুতরাং সে অন্যান্য নাবিকদের সংগে ষড়যন্ত্র করতে লাগল।

খালাসীরা শীঘ্রই একত্রিত হল। তাদের মধ্যে কেউই ওলন্দাজ নয় আর তাছাড়া তাদের প্রত্যেকেই কিছু না কিছু পাপ কাজ করেছে। সুতরাং তারা প্রধান খালাসীর কথায় সব কিছু করতে রাজী হল।

যখন উত্তমাশা অন্তরীপের কাছে জাহাজ এগিয়ে আসছিল, কাপ্টেন ও দায়াড্রিচ্ তখন ডেকের উপর বেড়াতে বেড়াতে হল্যাণ্ডের গল্প করছিল। এমন সময় হঠাৎ কয়েকজন খালাসী তাদের বেঁধে ফেলল। জাহাজের অন্যান্য উচ্চ কর্মচারীদেরও বন্দী করা হল। কাজেই জাহাজ বিদ্রোহী নাবিকদের হাতে চলে গেল।

খালাসীরা সে কাপ্টেন, দায়াড্রিচ ও অন্যান্য কর্মচারীর হাত-পা বেঁধে তাদের সমুদ্রে নিক্ষেপ করল। তারপর তারা নিকটবর্তী বন্দর অভিমুখে জাহাজ চালাল।

ইতিমধ্যে নাবিকদের মধ্যে প্লেগ দেখা দিল। তৃষ্ণায় প্রত্যেকের গলা শুকিয়ে কাঠ—কিন্তু জল নাই। তারা জাহাজে রক্ষিত পানীয় জল পূর্বেই ফেলে দিয়েছিল। জাহাজ তখন লবণাক্ত সমুদ্রের মাঝে, সুতরাং তাদের অবস্থা খুবই সঙ্গীন হয়ে উঠল। তৃষ্ণায় প্রত্যেকের প্রাণ বেরিয়ে যাবার উপক্রম হল।

নাবিকরা বন্দরে পৌঁছলে সেখানকার লোকরা প্লেগ-রোগাক্রান্ত দেখে তাদের তীরে নামতে দিল না।

প্রধান খালাসী বলল, আমাদের কাছে প্রচুর সোনা আছে। তার বদলে আমাদের কেবল একটু জল দাও। কিন্তু লোকেরা তাদের তাড়িয়ে দিল। পরের বন্দরেও কেউ তাদের জল দিল না। অগত্যা তারা প্রাচ্যের বন্দরের দিকে যাবার জন্য জাহাজের মুখ ঘোরাল। ইতিমধ্যে উঠল এক ভীষণ ঝড় এবং জাহাজ সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে পড়ল। ঝড় থামলে নাবিকেরা জাহাজ আবার তীরের দিকে নিয়ে আসার চেষ্টা করল, কিন্তু প্রবল ঝড় উঠতে জাহাজ তীর থেকে অনেক দূর গিয়ে পড়ল। সমুদ্রতীর আর দেখতে পাওয়া গেল না, বিশাল সমুদ্রের মধ্যে জাহাজ হারিয়ে গেল।

এই ঘটনার পর বহু বৎসর চলে গিয়েছে। কিন্তু আজও নাকি কোন

জাহাজ উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করার সময় রাতের কুয়াসা ও অন্ধকারের ভিতর দিয়ে বহু দূরে এক অদ্ভুত জাহাজকে দেখতে পায়। জাহাজটি বায়ুর বিপরীত দিকে চলেছে, কূল থেকে বহু—বহু দূরে। জাহাজটি অতি জীর্ণ, তার মাস্তুলও ভেঙে পড়েছে। বিভিন্ন নাবিকেরা তাকে বলে, 'অভিশপ্ত জাহাজ।' ওলন্দাজ নাবিকেরা বলে যে, কয়েকজন ওলন্দাজকে মেরে ফেলার জন্য ভগবানের অভিশাপে জাহাজের ঐ অবস্থা ঘটেছে। অভিশপ্ত জাহাজ কোনদিন আর তীরে ভিড়তে পারবে না।

রাজকুমারী ও স্ফটিক

(জাপানী উপকথা)

অনেক—অনেক দিন আগে জাপানে ওম্যাজো নামে একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যের এক বড় অংশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি নিজে রাজার মতই দেশ শাসন করতেন। তাঁর এক মেয়ে ছিল—তার নাম মাৎস্থ। সে এমনই সুন্দরী ছিল যে, পথ দিয়ে গেলে লোক ভেঙে পড়তো তাকে দেখতে। তার বাবা তার জন্য খুব গর্বিত ছিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, রাজা ছাড়া আর কারো হাতে তিনি তাঁর কন্যাকে সম্প্রদান করবেন না।

মাৎস্থর বয়স বাড়বার সংগে সংগে তার রূপের খ্যাতি দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে রাজপুত্র, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং রাজনীতিবিদেরা এলেন তাকে বিবাহ করার আশায়। কিন্তু মাৎস্থর বাবা তাদের কাউকেই পছন্দ করলেন না, কেননা তিনি রাজার সংগেই মেয়ের বিয়ে দেবেন স্থির করছেন।

বছরের পর বছর চলে গেল। মাৎস্থ কি সারাজীবনই অবিবাহিতা থাকবে? কোন রাজাই বিয়ে করতে এল না, তার বাবাও অন্য কাউকে কন্যা সম্প্রদান করবেন না।

এবার মাৎস্থর বিয়ে করতে ইচ্ছা হ'ল। তার সমবয়স্কা সমস্ত মেয়েই বিয়ে করেছে; কিন্তু সে ছোট মেয়েদের মত তার বাবার সাথে একাকী রয়েছে।

সিল্কের আসনে বসে চা খেতে খেতে একদিন সে ভাবল, জীবনটা বোধ হয় চা খেয়ে, ঘুমিয়ে আর বেড়িয়েই কেটে যাবে। কেননা নানারকম বিলাস-ব্যসনের মধ্যে থেকেও সে নিজেকে একা একা বোধ করতো।

ঠিক সেই সময় তুর্গের বাইরে এক গোলমাল শোনা গেল। মাৎস্থ

ঘর থেকে বহু লোকের চীৎকার, বাজনার শব্দ প্রভৃতি শুনতে পেল। সে দৌড়ে গিয়ে জানালা দিয়ে দেখলে, বহুমূল্য পোষাকপরিহিত কয়েকজন লোক ঘোড়ায় চড়ে সেদিকে আসছে।

মাৎসু আনন্দের হাসি হাসল—নিশ্চয় ভাল কিছু ঘটবে। সে হাততালি দিয়ে কয়েকজন পরিচারিকাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, এত জাঁকজমক করে আমাদের দুর্গে কারা আসছে?

পরিচারিকারা উত্তর দিল, আমরা জানলাম, এরা চীন-দরবার থেকে সম্রাটের আদেশে আসছেন। এদের মধ্যে আছেন রাজপুত্র ও সম্ভ্রান্ত সভাসদেরা।

কিন্তু আমার বাবার কাছে সংবাদ পাঠাবার জন্য এরকম আড়ম্বর কেন?

পরিচারিকারা কিছুক্ষণ চিন্তা করল। কারণ, তারা যা শুনেছে তা তাকে বলার উপযুক্ত কিনা ভেবে দেখল। পরিশেষে তারা বলল, শুনলাম যে চীনসম্রাট নাকি তোমার সৌন্দর্যের খ্যাতি শুনে তোমার পাণিগ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তোমাকে নিয়ে যেতে তিনি রাজপুত্র এবং রাজসভার সভাসদ্‌দের পাঠিয়েছেন।

মাৎসু এই সংবাদে এতই উৎফুল্ল হয়ে উঠল যে, সে তখনি নাচতে সুরু করে দিল। সে তার পরিচারিকাদেরকে এটা ওটা করতে বলল; কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই কি আদেশ দিল তা সে নিজেই ভুলে গেল। এই সময় তার ইচ্ছে হচ্ছিল তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে, এই সংবাদ সত্যি কি না। কিন্তু তখনি মনে হল, সম্ভ্রান্ত ঘরের জাপানী কুমারীর এমন কাজ করা ভাল দেখায় না।

এদিকে ওম্যাজো রাজপুত্র এবং তাঁর সভাসদ্‌দের মহাআড়ম্বরে অভ্যর্থনা করলেন। দুর্গের সবচেয়ে বড় ঘরটিতে তাঁদের থাকতে দেওয়া হল নানা রকম ভাল ভাল খাদ্য দিয়ে তাঁদের পরিতৃপ্ত করা হল।

কিছুক্ষণ অবসর পেয়ে ওম্যাজো অন্তঃপুরে গিয়ে তাঁর মেয়েকে ডেকে পাঠালেন। মাৎসু ছিল খুবই বিনয়ী ও ভক্তিমতী মেয়ে। পিতার

আহ্বানে সে হাত জোড় করে পিতার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ওম্যাজো তাকে বসতে বললে, সে বসল।

পরিচারিকাদের প্রদত্ত সংবাদ সত্যিই। ওম্যাজো তাকে বললেন যে, চীনসম্রাট তাকে বিয়ে করবেন আর এতে মাৎসু তার পিতার চেয়েও বেশী সম্মানের পাত্রী হবে।

কিন্তু বাবা! সে সজল চোখে বলল, তোমার চেয়ে বেশী উঁচুপদে অধিষ্ঠিতা হতে আমার ইচ্ছে নেই। আমি চাই, যে আমাকে ভালবাসে আর আমি যাকে ভালবাসি তাকে পেয়ে সুখী হতে। যাঁকে কোনদিন আমি দেখি নি, সেই চীনসম্রাটকে কতখানি ভালবাসতে পারব, তা আমি জানি না। এই বলে মাৎসু কাঁদতে লাগল।

পিতা তার চোখে জল দেখে তার নতুন জীবন সম্বন্ধে অনেক কথাই বললেন। তিনি তার ভবিষ্যৎ ধনরত্নের কথা বললেন। চীনসম্রাট বলে পাঠিয়েছেন যে, যদি মাৎসু তাঁকে বিয়ে করে, তাহলে অনেক মূল্যবান উপহার তিনি এখানে পাঠাবেন।

একথা শুনে মাৎসু চোখের জল মুছল, হেসে বলল, আমি কি তখন মন্দিরে উপহার পাঠাতে পারব ? মাৎসু কিন্তু মন্দির খুব ভালবাসতো। মন্দিরে এখনও সে প্রার্থনা করতে বা উপহার দিতে যায়।

নিশ্চয়ই,—পারবে বৈকি, ওম্যাজো বললেন, আমার সাধ্যের চেয়ে বেশী মূল্যবান উপহারই তুমি পাঠাতে পারবে। মাৎসু আর কাঁদল না।

পিতার কাছ থেকে এসে সে পরিচারিকাদের তার নতুন জীবনের কথা বলল। তারাই ছিল মাৎসুর খেলার সাথী ; সুতরাং তারা তাদের মনিব চলে যাবে শুনে খুব দুঃখিত হল। তারা তাকে বলল যে, সে যেন তাদের সংগে করে নিয়ে যায়। মাৎসু বলল, সে কয়েকজনকে সমুদ্রের ওপারে নিয়ে যাবে।

মাৎসু শেষবারের জন্য একবার মন্দিরে গেল। সেখানেও সে প্রতিজ্ঞা করল যে, সে চীনের সম্পদের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান দ্রব্যটি পুরোহিতদের উপহার পাঠাবে।

তারপর একদিন মাৎসু চীনদেশে পাড়ি দিল। তার পিতা বিষণ্ণচিত্তে তাকে বিদায় দিলেন। 'স্বর্গের আলো' মাৎসুকে হারিয়ে সবই যেন অন্ধকার হয়ে গেল।

সমুদ্রযাত্রার প্রথমে মাৎসু খুবই কাঁদল, কোন কিছুই যেন ভাল লাগে না। সে খুব লাজুক ছিল বলে তাকে যে বিশেষ সম্মান দেওয়া হতে লাগল, তা গ্রহণ করতেও লজ্জা পেল। অবশেষে তাকে যখন চীনসম্রাটের সামনে নিয়ে যাওয়া হল, তখন সে এমনি লজ্জিত এবং ভীত হয়ে পড়ল যে, কোন কথা না বলে কেবল কাঁদতে লাগল।

কিন্তু সম্রাট তার হাত ধরে মধুর স্বরে কথা বলতে লাগলেন। তিনি তাকে বললেন যে, তার আসার পথ চেয়ে তিনি বড়ই উদ্বিগ্ন ছিলেন, এখন তাঁর হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

বিবাহ-উৎসব শেষ হবার পর সম্রাট তাকে নিয়ে রাজপ্রাসাদের সমস্ত জিনিস দেখাতে লাগলেন। শ্বেত পাথর ও মণিমুক্তাখচিত ঘর, বহুমূল্য আসবাব প্রভৃতি দেখালেন। তিনি তাকে একটা বাগান দেখালেন, তার পথগুলি সোনারূপোয় মোড়া। সুতরাং মাৎসু চাঁদের আলোয় যখন ইচ্ছা সোনারূপোর পথ দিয়ে হাঁটতে পারবে। এই বাগানে এছাড়া নানা রং-এর ফুল ছিল। এইসব ফুল সারাবৎসরই বাগান আলোকিত করে রাখত। এছাড়া বহু ঝরণা ঝর্ ঝর্ করে বইত এই বাগানে, আর পাখীর দল মধুর স্বরে গাইত গান। চীনসম্রাটের এই বাগানের মত বাগান পৃথিবীর অন্য কোথাও ছিল না।

এভাবে মাৎসু রাজপ্রাসাদের সৌন্দর্য দেখে লজ্জা ভুলে গেল এবং সম্রাটের সংগে সহজভাবে কথাবার্তা বলতে লাগল। সে তাঁকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত, তিনিও সানন্দে তার উত্তর দিতেন।

মাৎসু তো রাজপ্রাসাদে সুখে বাস করতে লাগল। কিন্তু সে তার প্রতিজ্ঞার কথা ভোলে নি। সে চীন সাম্রাজ্যের সবচেয়ে মূল্যবান্ সম্পদ জাপানের মন্দিরের পুরোহিতদের কাছে পাঠাবার জন্য সম্রাটকে অনুরোধ

করল। সম্রাট সব শুনে বললেন যে, উপহার পাঠানো অবশ্যই উচিত এবং এ ব্যাপারে তিনি তাকে যথাসাধ্য সাহায্য করবেন।

সম্রাট দেশের ধনী বণিকদের ডেকে তাদের সবচেয়ে ভাল সম্পদ নতুন সম্রাজ্ঞীকে উপহার দিতে বললেন। তারা একের পর একজন এসে মাৎসুর সামনে সুন্দর সুন্দর মূল্যবান জিনিস রাখতে লাগলো। মাৎসু ভেবে ঠিক করতেই পারলো না যে, কোন্‌টা সে নেবে। নানা রকম আশ্চর্য জিনিস সেখানে ছিল। একটা পাখী ছিল, তার গায়ে হাত দিলেই নাচ্‌তে আরম্ভ করতো। একটা সেখানে দোয়াতদান ছিল, যার কালি কোনদিনই শুকাবে না, আর একটা বোতলে তেল ছিল—যা ব্যবহার করলেও কোনদিন শেষ হবে না।

এইসব সুন্দর জিনিসের মধ্যে একটা অদ্ভূত স্ফটিক ছিল—যা থেকে সূর্যের মত আলোক চারদিকে বিচ্ছুরিত হতো। এমন কি, খুব অন্ধকার জায়গায় রাখলেও এর দীপ্তি জায়গাটিকে দিনের মত করে রাখতো। মাৎসু অবশেষে এই স্ফটিকটাকেই বেছে নিল।

ঐ স্ফটিকটি একটি সোনার বাক্সের ভিতর রেখে এক বড় জাহাজের কাপ্তেনের হেফাজতে পাঠানো হলো। মাৎসু নিজেই সেই বাক্সটি কাপ্তেনের হাতে তুলে দিয়ে জাপানের পুরোহিতদের কাছে সেটা পৌঁছে দিতে বললো।

সশস্ত্র সৈন্য-বেষ্টিত হয়ে এই বাক্স সমুদ্রতীরে পৌঁছাল! তারপর সেটাকে নিরাপদে জাহাজে ওঠানো হলো। জাহাজে দিবারাত্র তুজন নাবিক বাক্সটাকে পাহারা দিত।

সমুদ্রযাত্রা প্রথম কিছুদিন নিরাপদেই কাটলো। সোনার বাক্সটা ঠিক আছে কিনা তা কাপ্তেন প্রতিদিনই দেখতেন। বাতাস অনুকূলেই ছিল, সুতরাং সবাই ভাবলো যে নিরাপদেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো যাবে।

কাপ্তেন ভাবলেন এ কাজটা মোটেই কঠিন নয়। নিরাপদে এই স্ফটিকটি পৌঁছে দিলেই তাঁর প্রাপ্য টাকা সহজেই পাবেন।

কিন্তু জাপানের নিকটবর্তী হতেই বিপদের কালোমেঘ দেখা দিল।

হঠাৎ ভীষণ ঝড় উঠলো। উত্তাল তরঙ্গ জাহাজের উপর আছড়ে পড়তে লাগলো, সমুদ্রের জল জাহাজের উপর পর্যন্ত উঠে পড়লো। কাপ্তেন বুঝলেন জাহাজের এবার শেষ অবস্থা। কিন্তু হঠাৎ যেন যাদুমন্ত্রে ঝড় থেমে গেল, জাহাজ আবার সমুদ্রে ভাসলো। প্রকৃতি শান্ত হয়ে এলো।

কাপ্তেন ভাবলেন, যাহোক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কিন্তু একঘণ্টা পরেই একজন নাবিক ছুটে এসে তাঁকে খবর দিল যে, স্ফটিকের বাক্সটাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

কি বললে? কাপ্তেন চীৎকার করে বলেন, যে বাক্সটাকে আমার জীবনের চেয়ে বেশী মূল্যবান মনে করি, সেটা হারিয়ে গেছে? অসম্ভব! এস, খুঁজে দেখি, ঘরের কোন অন্ধকার কোণে হয়ত পড়ে আছে।

জাহাজের প্রতিটি জায়গা তন্নতন্ন করে খোঁজা হলো। কিন্তু বাক্সের কোন হদিসই মিললো না। কাপ্তেন হতাশ হয়ে বললেন, আমি সবই বুঝেছি। সমুদ্রের ড্রাগনই ঝড়ের সৃষ্টি করে বাক্সটা চুরি করে নিয়ে গিয়েছে! আমি শুনেছি যে, এই স্ফটিকটা বহুদিন আগে সমুদ্রের তলার ড্রাগনের প্রাসাদ থেকে অপহৃত হয়েছিল। তখন থেকে সে এটা খুঁজে বেড়াচ্ছে।

খুব বুড়ো নাবিক বললো, কাপ্তেন! এ বিষয়ে প্রাচীন এক গল্প প্রচলিত আছে। বহুদিন আগে সমুদ্রের ড্রাগন একজন মৎস্য-কন্যাকে ভালবেসেছিল। সে তার জন্য প্রবালের এক প্রসাদও নির্মাণ করেছিল। তাকে সে নানা জিনিস উপহারও দিয়েছিল। তার মধ্যে এই স্ফটিকটা ছিল অন্যতম। মৎস্যকন্যা এটা হাতছাড়া করতো না, কারণ, এটা ড্রাগনের জিনিস। বহুবছর ধরে সেই মৎস্য-কন্যা প্রবালদুর্গে বাস করতে লাগল পরম সুখে। মৎস্যকন্যারা কখনও বৃদ্ধা কিংবা কুৎসিত হয় না, তাই যখন তৎকালীন চীনসম্রাট একদিন সমুদ্রপথে জাপানে যাচ্ছিলেন, মৎস্য-কন্যা তাঁকে দেখে মুগ্ধ হয় এবং ড্রাগনকে ছেড়ে সম্রাটের সংগে চলে আসে। এই স্ফটিকটি সে সম্রাটকে দান করে। তখন থেকে সমুদ্রের ড্রাগনও সেটা উদ্ধারের চেষ্টায় আছে। এই গল্পটা কিন্তু বহুদিন ধরে চলে আসছে।

কাপ্তেন বললেন, আঃ, এতক্ষণে আমি বুঝলাম। বেশ, এখন আমাদের উচিত ড্রাগনের হাত থেকে সেই স্ফটিক উদ্ধার করা। তিনি বসে বসে ভাবতে লাগলেন যে কি করা যায়। তিনি ঘোষণা করলেন, যে-নাবিক সমুদ্রে নেমে স্ফটিকটি খুঁজে আনবে, তাকে প্রচুর ধনরত্ন পুরস্কার দেওয়া হবে। কিন্তু সকলেই সমুদ্রের ড্রাগনের পরাক্রমের কথা শুনেছিল, সুতরাং কেউই এ প্রস্তাবে রাজী হলো না।

কাপ্তেন হতাশ হয়ে ভাবলেন, তিনি একথা চীন-সম্রাজ্ঞীকে আর জানাবেন না। আবার তিনি সমানে জাহাজ চালনা করলেন। স্ফটিক উদ্ধারের যে কোন উপায় তাঁকে ঠিক করতেই হবে।

জাপানের নিকটবর্তী হলে তারা কতকগুলো জেলেডিঙি দেখতে পেলেন। এই জেলেদের পুরস্কারের লোভ দেখালেন কাপ্তেন। কিন্তু স্ফটিক খোঁজার কাজে মাথা নেড়ে অসম্মতি জানিয়ে তারা মাছ ধরার কাজেই মনোযোগ দিল। একজন বৃদ্ধ জেলে কিন্তু কাপ্তেনের সংগে এ-বিষয়ে আরও কথাবার্তা বলতে ইচ্ছে করল।

সে বলল, "কাপ্তেন, আমি ড্রাগনের হাত থেকে স্ফটিকটি উদ্ধার করতে পারি, কিন্তু এক সর্তে। আমি বৃদ্ধ, এই পৃথিবীতে আমার প্রয়োজন কম ; আমরা খুব গরীবও বটে। সুতরাং আমি আমার জীবনের বদলে আমার পুত্রের জন্য কিছু প্রার্থনা করতে পারি কি ?"

তুমি স্ফটিকটি উদ্ধার করে আনতে পারলে তোমার নিজের জন্য না হয়, তোমার ছেলের জন্য যে কোন পুরস্কার চাইলেই পার—কাপ্তেন বললেন।

তাহলে আমার অনুরোধ যে, আপনি বৃদ্ধ ও অক্ষম পিতার পরিবর্তে তার পুত্রকে একজন সুশিক্ষিত ভদ্রলোক করে গড়ে তুলবেন, যাতে ভবিষ্যতে সে আপনার জাহাজের কাপ্তেন হতে পারে। এ ছাড়া আমি আর কোন পুরস্কার চাই না। আপনি কি এতে সম্মত ?

কাপ্তেন কিছুক্ষণ ভেবে মাথা নেড়ে বললেন, হ্যাঁ, তোমার প্রার্থনা পূরণ করা হবে, কিন্তু তুমি তার আগে স্ফটিক উদ্ধার তো কর।

বৃদ্ধ জেলে তাড়াতাড়ি ডুবুরির পোষাক পরে সমুদ্রের অতল গহ্বরে নেমে পড়ল। নামতে নামতে সে অবশেষে সমুদ্রের তলদেশে গিয়ে পৌঁছল।

প্রথমে কিছুক্ষণ সে চারধারে চেয়ে দেখল, সে কোন্ দিকে যাবে। তার চোখে পড়ল সুন্দর এক প্রবালের প্রাসাদ। তার চারদিকে নানা রং-এর ফুলের বাগান। বৃদ্ধ জেলে বুঝতে পারল যে এই প্রাসাদেই তার ঈপ্সিত স্ফটিকটি আছে। প্রাসাদের কাছে গিয়ে দেখল যে এর ভিতর থেকে চন্দ্র কিংবা তারকার আলোর চেয়ে বেশী উজ্জ্বল একরকম আলো বের হচ্ছে। সে বুঝল, স্ফটিকখানা ঐখানেই আছে।

ধীরে ধীরে সে আলোর দিকে যেতে লাগল। তার গতি হলো খুবই মন্থর। কেননা তাকে চলতে হচ্ছিল কঠিন শিলাস্তরের উপর দিয়ে পথ করে এবং সমুদ্রের ভাসমান শেওলায় তার হাত-পা জড়িয়ে যাচ্ছিল। এছাড়া অন্য বিপদও ছিল। একবার এক সমুদ্রের সাপ তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলো, এক কাঁকড় তাকে কামড়াতে এলো, আর একবার সেই শিলাস্তর কিংবা আগাছার অন্তরালে আশ্রয় নিয়ে রক্ষা পেল।

এসব বিপদের মধ্যেও বৃদ্ধ জেলে সেই আলো অনুসরণ করে প্রবাল দুর্গের দিকে চলতে লাগল। কিছুদূর এগিয়েই সে যা দেখল তাতে তার সাহসী হৃদয়ও কাঁপতে লাগল। সে দেখল সাদা মার্বেল পাথরের স্তূপের উপরে সেই স্ফটিকটি বসানো রয়েছে। সেটা থেকে চারদিকে আলো বের হচ্ছে আর তার দুদিকেই দুটো ড্রাগন পাহারা দিচ্ছে।

ভয় পেলেও বৃদ্ধ গুঁড়ি মেরে শিলাস্তর এবং আগাছার অন্তরালে থেকে অগ্রসর হতে লাগল। সে ভাবল যে, সে এভাবেই স্ফটিকের কাছে পৌঁছতে পারবে, কেননা সে দেখল যে, ড্রাগন দুটো বসে বসে ঘুমোচ্ছে।

কোন শব্দ না করে সে এগোতে লাগল। যখন সে ড্রাগনদের কাছে গিয়ে পৌঁছল, তখন সে দৌড়ে গিয়ে ড্রাগনদের মাঝ থেকেই স্ফটিকটা তুলে নিল। ড্রাগনদের জাগতে না দিয়েই সে একাজ করল; কিন্তু তাড়াতাড়িতে তার পা একটা ঘুমন্ত সমুদ্র-কাঁকড়ার দাড়ার উপর পড়ে

গেল। কাঁকড়াটা জেগে গিয়ে তার সংগে যুদ্ধ শুরু করল। গোলমালে একটা ড্রাগনের ঘুম ভেঙে গেল।

ড্রাগনটা স্ফটিকের আলো দেখতে না পেয়ে সব বুঝল। সে অন্যান্য ড্রাগনদের ডেকে খোঁজাখুঁজি শুরু করল; তারা ছুটে এলো ভীষণ গর্জন করতে করতে। লেজ দিয়ে তোলপাড় করতে লাগল সমুদ্রের জল। সমুদ্রে তুরন্ত বিক্ষোভ সূচনা হলো।

বৃদ্ধ জেলে রক্ষা পাবার জন্য দৌড়তে লাগল। কিন্তু তার পরণে ডুবুরির পোযাক থাকায় তাড়াতাড়ি চলতে পারছিল না। ড্রাগনরা তাকে খুঁজবার জন্য চারিদিকের জলে ভীষণ আলোড়নের সৃষ্টি করছিল। সে শিলাস্তরের ফাঁকে ফাঁকে লুকিয়ে পথ করে যেতে লাগল। স্ফটিক থেকে যাতে আলো না বেরোয় সেজন্য সেটাকে সে পোষাকের ভেতর ভাল করে ঢেকে রেখে দিল। স্ফটিকের আলো বের হলে তার ধরা পড়ার সম্ভাবনা।

ড্রাগনরা কিন্তু তাকে ধরতে পারল না। এতে জেলের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হলো। সে জাহাজ থেকে বেশীদূরে ছিল না। কিন্তু ড্রাগনরা তখনও তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

একটা ড্রাগন একবার তার সামনাসামনি এসে পড়ল। সে একপাশে সরে গেল। ড্রাগনটা তাকে দেখতে না পেয়ে অন্য দিকে চলে গেল বটে, কিন্তু তার লেজের আঘাতে বৃদ্ধ জেলের একটা হাত একেবারে নষ্ট হয়ে গেল।

কোনরকমে সে জাহাজে পৌঁছল। নাবিকরা সবাই ছুটে এলো। বৃদ্ধ জেলে অতিকষ্টে মূল্যবান স্ফটিকটিকে বের করে কাপ্তেনের হাতে দিয়ে অস্ফুটস্বরে বলল, আমার অবস্থা শেষ হয়ে এসেছে। তোমার প্রতিজ্ঞার কথা মনে রেখো। এই বলেই বৃদ্ধ জেলে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

কাপ্তেন প্রথমে জাপানের এক বন্দরে নামলেন; তারপর সেই মন্দিরে গেলেন। সেখানে গিয়ে নিজহাতে সেই স্ফটিকটি পুরোহিতদের সমর্পণ করলেন।

তারপর কাপ্তেন চীনে ফিরে গিয়ে চীন-সম্রাজ্ঞীকে সমস্ত কথা খুলে বললেন। কিভাবে সমুদ্রে ঝড় উঠলো, স্ফটিকটা অপহৃত হল এবং কিভাবে সেই বৃদ্ধ জেলে নিজপ্রাণ বিসর্জন দিয়ে সেটা ড্রাগনদের হাত থেকে আনল—এসব আগাগোড়া সে একে একে বর্ণনা করল। তারপর কাপ্তেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি সেই বৃদ্ধ জেলেকে পুরস্কার দিতে ইচ্ছুক কি না।

দয়ালু তরুণী সম্রাজ্ঞী বৃদ্ধ জেলের পুত্রকে ডেকে পাঠিয়ে চীন-দরবারে তাকে সম্মানের আসন দান করলেন এবং নিজের ভাইয়ের মতই তাকে দেখতে লাগলেন। যখন সে বুড়ো হয়ে এলো, তখন মাৎস্থ তাকে তার একটা জাহাজের কাপ্তেন করে দিল। সেও পিতার মত সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কিন্তু তার বাবার সংগে একজায়গায় তার বেশ পার্থক্য ছিল। তার পিতার ছিল একটা ছোট্ট মাছধরা ডিঙি, আর তার হলো যেমন বিরাট এক জাহাজ, তেমনি তাতে বহু লোক-লস্কর।

———

